এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫
মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীদুর্গাদাস রায়

করকমলেষু

॥ সূচীপত্র ॥

সাহিত্যিকের দায়িত্ব	...	৩
রবীন্দ্রায়ণ	...	৫
হুঁশিয়ারি	...	১৭
স্বাধীনতার এক যুগ পরে	...	২২
সূর্যগ্রহণ	...	২৮
গণতন্ত্র প্রসঙ্গে	...	৩৭
বাঙালীর ক্ষুধা	...	৪০
অপক্ষপাত	...	৪৮
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৫১
রাজশেখর বসু	...	৫৪
আধুনিক জাপানী সাহিত্য	...	৫৬
বোরিস পাস্তেরনাক	..	৭৯
ড্রাগনের দাঁত	...	১০৩
ঐক্যের সাধনা	...	১২০
শিশিরকুমার ভাদুড়ী	...	১২৬
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন	...	১২৯
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	...	১৩২
রামানন্দ স্মরণে	...	১৩৬
টলস্টয়	...	১৪২
মহর্ষি কার্বে	...	১৪৮

ভূমিকা

"সূর্যগ্রহণ" প্রবন্ধটির নাম গোড়ায় ছিল "ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন।" আরো আগে লেখা "চন্দ্রগ্রহণে"র সঙ্গে মিলিয়ে পরে নামকরণ হয় সূর্যগ্রহণ।" অর্থাৎ পাকিস্তানে যেমন ডিক্‌টেটরশিপ ভারতের একাংশে তেমনি রাষ্ট্রপতির শাসন।

"সূর্যগ্রহণ" লেখার পর রাজনীতির উপর আমার ঘেন্না ধরে যায়। আমি স্থির করি যে রাজনৈতিক রচনা আর নয়। হাজার প্রযোজন· থাকলেও না। সাহিত্যে আমার যেসব কাজ বাকী আছে সেসব যদি সময় থাকতে সারা করতে হয় তবে সর্বপ্রকার অবান্তর প্রযাস থেকে আমার এই বযসের জীবনীশক্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে, সংহত করতে হবে। নইলে জীবনের পাট অসমাপ্ত থেকে যাবে। সাহিত্যে একজনের কাজ আরেকজন করে দিতে পারে না। বরং রাজনীতিতে পারে।

সাহিত্যের দাযিত্ব যার ঘাড়ে রাজনীতির দায়িত্ব তাকে ঘাড় থেকে নামাতেই হবে। অথচ এই "সমুদ্রের বুড়ো" কি সহজে নামতে চায়! সিন্দবাদ নাবিকের পিঠ ছেড়ে কবে একদিন আমার পিঠে চেপে বসেছে। অসমের মর্মন্তুদ ঘটনাগুলোর বিবরণ পড়ে ও শুনে অশান্ত বোধ করলেও কলম নামক অশ্বটিকে দৃঢ় হস্তে নিবৃত্ত করি। নীরব আমি ছিলুম ও থাকতুম, যদি না অন্তরেব মৌচাকে ঢিল মারতেন অচেনা এক পত্রপ্রেরক। নীরব থাকাও তাঁর চোখে অপরাধ। তা সত্ত্বেও আমি পূর্ব সংকল্পে স্থির থাকতুম, যদি না "আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় সংখ্যা" থেকে আমার গল্প "তান্ত্রিক" ঘুরে আসত, যদি না তাঁরা চাইতেন অন্য একটি গল্প, বিকল্পে প্রবন্ধ। পাঠানোর মেয়াদ

উত্তীর্ণপ্রায়। গল্প আর হয় না। নিজের শান্তির জন্যেই লিখতে বসি "ড্রাগনের দাঁত"। চার পৃষ্ঠা লিখেই থামি। কিন্তু কে যেন আমাকে ঘাড় ধরে বার বার ওঠায়, বার বার লেখায়। এগারো পৃষ্ঠা লিখে সেদিন ছুটি পাই। একনিঃশ্বাসে লেখা প্রবন্ধে ভুলচুক থাকবেই। সংশোধনেরও অবকাশ ছিল না। এখন কিছু কিছু রদবদল করেছি। আমার মতগুলো আমারি। আর ঐতিহাসিক তথ্যগুলো প্রধানত ডকৃটর বিবিঞ্চিকুমার বরুয়ার। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ।

"ড্রাগনের দাঁত" গ্রীক পুরাণের কল্পনা। জেসন যখন সোনালী মেষলোম আনতে মিডিযার দেশে যান তখন রাজা তাঁকে মাঠে হাল দিযে ড্রাগনের দাঁত বুনতে বলেন। তিনি জানতেন না যে অমন করলে সশস্ত্র সৈনিকরা ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে। যে বোনে সে মরে। মিডিয়ার মন্ত্রণায় তিনি অলক্ষ্যে ছুঁড়ে মারেন একটি ঢেলা। পরস্পরকে দোষ দিয়ে ওরাই পরস্পরকে বিনাশ করে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

দেখা

সাহিত্যিকের দায়িত্ব

আকাশে দ্বিতীয় এক চন্দ্র পৃথিবী পরিক্রমা করছে শুনে আমার এক বন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'মানুষই ভগবান। মানুষের অসাধ্য কর্ম একদিন হয়তো ছিল। এখন থেকে আর নেই। মানুষ ইচ্ছা করলে আর একটা চাঁদ কেন, আর একটা সূর্য সৃষ্টি করতে পারে। হাঁ, আর একটা বিশ্ব। বিশ্বামিত্র যা করতে চেয়েছিলেন।'

মানুষ যে প্রলয়ঙ্কর তার সাক্ষ্য আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পেয়েছিলুম। তার পরেও সে প্রমাণ আরো জমেছে। শাস্ত্রোক্ত মহাপ্রলয় হয়তো মানুষই একদিন ঘটাবে। কিন্তু তার আগে শুধু কতকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ নয়, এক বা একাধিক কৃত্রিম গ্রহ সৃষ্টি করে সে আরো বড় গৌরবের অধিকারী হয়েছে। শুনতে পাই চন্দ্রলোকে অভিযানের জন্যে মানুষ তৈরি হচ্ছে। বহুলোক বিশ্বাস করে যে পাঁচ দশ বছরের মধ্যে চাঁদে যাবার অসমানী ভেলায় চড়ে সশরীরে চাঁদে পৌঁছে যাবে। যারা বিশ্বাস করে না তারাও কবুল করে যে অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের উপর এই যে আস্থা এর জন্যে বৈজ্ঞানিকদের উচ্চতা বেড়ে গেছে। একটু আগে রাজনীতিকদের সম্মান ছিল সব চেয়ে বেশী। এখন বিজ্ঞানীদের উপরেই সকলের নজর। এমন কি স্বয়ং রাজনীতিকরাই তাঁদের মুখাপেক্ষী। পরমাণবিক শক্তির জন্যেই হোক আর গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টির জন্যেই হোক রাজনীতিকরা এখন তাঁদের কাছে হাত জোড় করে দরবার করছেন। তাঁরা জিতিয়ে দিলেই এঁরা জিতবেন, নয়তো এঁদের হার হবে।

সব দেশেই সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের নিযে যে পরিমাণ আগ্রহ দেখা যায সাহিত্যিকদের নিযে তার সিকিভাগও নয়। সাহিত্যিকদের উপর রাজারাজড়াদের দৃষ্টিপাত হয কখন? যখন প্রচাবকার্যের প্রযোজন হয। আর প্রজাসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয কখন? যখন মনোরঞ্জন করা হয। প্রোপাগাণ্ডা আর এণ্টারটেনমেণ্ট এর কোনোটাই সর্বশক্তিমত্তার পবিচাযক নয়। এতে সাহিত্যিকের উচ্চতা বাড়ে না। মানুষেরও ইজ্জৎ বাড়ে না। সব দেশেই সাহিত্যিকদেব স্থান পিছনের সারিতে। কী রাজসভায, কী প্রজাপরিষদে।

এর জন্যে সাহিত্যিকদেব নিজেদেরই দাযিত্ব বেশী। অর্থনীতি ও রাজনীতি নিযে তাঁরা যে পরিমাণ ব্যস্ত ঠিক সেই পবিমাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট। যন্ত্ররাজ বিভূতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায নেমে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি তাঁদের দ্বারা হবার নয, এটা ঠিক। কিন্তু মানুষ যেখানে লীলাময সেখানে সে ভগবানেরই দোসব। সেই বৈকুণ্ঠের গান কি কম মূল্যবান? সাহিত্য বিজ্ঞানকেও ছাড়িযে যেতে পারে। কিন্তু তাব লীলার ক্ষেত্র জড়জগৎ নয। সাহিত্যিকের অন্তর্জীবন সমৃদ্ধ না হলে সে লীলার জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না। এইজন্যে তাকে ধ্যানস্থ ও আত্মস্থ হতে হয।

(১৯৫৯)

রবীন্দ্রায়ণ

'রবীন্দ্রজীবনী'র স্থচনা ১৯২৯ সালে, সমাপ্তি ১৯৫৪ সালে। নিজের জীবনের পঁচিশ বছর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আশি বছরের হিসাবনিকাশ করেছেন তাঁব বত্রিশ বছরের সহকর্মী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলাভাষায এত বড় জীবনচরিত এর আগে লেখা হয়নি। এত বড জীবন থাকলে তো হবে ?

এই সার্ধসহস্রপৃষ্ঠার 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' সাইজের গ্রন্থ সন তারিখ তথ্য প্রমাণ দিয়ে ঠাসা। গ্রন্থকার প্রধানত ঐতিহাসিক কর্তব্য করেছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হননি। গুরু-ভক্তিকে তিনি পদে পদে সংযত করেছেন, নইলে এও হতো আর একখানি 'রবীন্দ্রচরিতামৃত' কিংবা 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরবীন্দ্রনাথ'। দু'এক জাযগায় তিনি গুরুদেবের গুরুমশাই হয়ে কান মলে দিতেও ছাড়েননি। আরো মলতে পারতেন, কিন্তু তা হলে বিপক্ষের হর্ষবর্ধন করা হতো।

দিকে দিকে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাডম্বরে। তা দেখে যদি কেউ মনে করে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ নিষ্কণ্টক হযেছেন তা হলে তিনি ভুল করবেন। অল্প বযস থেকেই কবির যেমন এক দল উৎসাহী ভক্ত জুটেছিলেন তেমনি তার চেয়ে বড এক দল বিপক্ষ। নোবেল প্রাইজের পরেও বিরোধীরা নির্বিষ হননি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি কবির মনোভাব তাঁদের অভিনব সুযোগ দিল। আমার বেশ মনে আছে মৃত্যুর এক বছর আগেও গুরুদেবের মন তাঁর স্বদেশবাসীর নিন্দাবাদে বিরূপ ছিল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সকলের অন্তঃপরিবর্তন ঘটল, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। সুতরাং সমালোচনা করতে গিয়ে নিন্দার

খোরাক দেওয়া স্থগিত রাখতে হচ্ছে। কবিকে তাঁর যথার্থ বিচারের জন্যে আরো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।

আবার রবীন্দ্রনাথের উপর সুবিচার করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের উপর অবিচার করাও উচিত নয়। চিত্তরঞ্জনের সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিক-পত্রের সঙ্গে আমার বাল্যকালে পরিচয় ছিল। 'ফাল্গুনী'র বিরুদ্ধে এক-জনের কটূক্তি আমার এখনো মনে আছে। লেখক রবীন্দ্রনাথকে চোর প্রমাণ করতে কোমর বেঁধে ওকালতি করেছিলেন। কিন্তু এর থেকে চিত্তরঞ্জনের উপর অসূয়া সুস্পষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'সাগর সঙ্গীত' সম্পর্কে মৌন ছিলেন বলে যে চিত্তরঞ্জন রবিনিন্দায় মুখর ছিলেন এটা নিতান্তই একটা অনুমান। আসলে হয়েছিল এই যে মহর্ষির মৃত্যুর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই বাম দিকে যেতে যেতে প্রায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এলাকায় দুই পা রেখেছিলেন। পক্ষান্তরে চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে ক্রমেই ডান দিকে যেতে যেতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তল্লাট ছাড়িয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চৌহদ্দিতে এক পা রাখেন। অসহযোগ আন্দোলনেব সময় দেখা গেল দেশবন্ধুর আর এক পা কালীঘাটে। বিপিনচন্দ্র অমন করে ব্রাহ্মত্ব বিসর্জন দেন নি। তা হলেও তাঁর জীবনের পরিণতি বৈষ্ণবধর্মের অভিমুখীন। ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণ শিথিল হয়ে এসেছিল। তাই নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষ শ্রীঅরবিন্দ হয়েছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এমন কথা বলা চলে যে 'বঙ্গদর্শনের'র যুগে তিনি যে পরিমাণে ব্রাহ্মণ ছিলেন সে পরিমাণে ব্রাহ্ম ছিলেন না। আদি ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে বড় তখন অনাদি ব্রাহ্মণ সমাজ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকাল। এই সময়টাতে রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রথমে

দেখি ব্রাহ্ম থেকে ব্রাহ্মণ হতে, তার পরে ব্রাহ্মণ থেকে ব্রাহ্ম হতে, তারপর আদি ব্রাহ্ম থেকে বাইরে না হোক ভিতরে ভিতরে সাধারণ ব্রাহ্ম হতে। যদিও হিন্দু বলে পরিচয় দিতে কখনো তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্ম হচ্ছেন পিতা। পিতৃভাবের সাধনায় রস জমে না। তাই চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব সাধনায়—বিশেষ করে পদাবলীকীর্তনে—ভগবানকে খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথও কি ভগবানকে প্রেমিক ও আপনাকে নারী বলে কল্পনা করেননি?

'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' তিনখানাই বৈষ্ণব ধারার কাব্য। 'বলাকা' থেকে আবার অন্য ধারা শুরু। এবার পাশ্চাত্য দর্শনের। বিবর্তনসূত্রে তিনি যেখান থেকে সরে যান চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র সেখানেই আশ্রয় নিয়ে অন্তরে শান্তি পান। সুতরাং বিরোধটা ব্যক্তিগত নয়, নী[illegible]। এ কথা কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বেলা খাটে না। বাংলাসাহিত্যে তখনকার দিনে দ্বিজেন্দ্রলালই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলাল কেবলি সিংহনাদ করেছেন। অশ্লীলতা, লালসা ইত্যাদি কত কী আবিষ্কার করেছেন। অমন নিরামিষ রচনার মধ্যেও আমিষের গন্ধ পেয়ে উগ্রচণ্ড হয়েছেন। 'আনন্দবিদায়ে'র মতো নাটক (প্রকাশ ১৬ই নভেম্বর, ১৯১২) লেখা হয় ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র (প্রকাশ অক্টোবর, ১৯১২) বিশ্বময় জয়ধ্বনির [illegible]ব। যাঁরা উভয়ের ভক্ত তাঁদের পক্ষে হৃদয়বিদারক ঘটনা। তবে অন্যান্য সাহিত্যেও এর নজীর আছে।

'রবীন্দ্রজীবনী' চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনতিকাল পরে। তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৪ সালের শেষভাগে। চতুর্থ খণ্ড কবির মহাপ্রয়াণের পরে। পরিশিষ্ট সমেত। কবির জীবনকেও মোটামুটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু ও ভাবে নয়।

রবীন্দ্রনাথের একুশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় খুলে যায়। তাঁর নিজের কথায়—“সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ হয় ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া চলিল।”

জীবনের প্রথম অধ্যায়েও তাঁর সাহিত্যকীর্তি অসামান্য ছিল না। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন শিক্ষানবীশ। কতকটা বৈষ্ণব কবিদের কাছে, কতকটা পাশ্চাত্য কবিদের কাছে, কতকটা বিহারীলালের কাছে, কতকটা বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। কিন্তু হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বরূপদর্শনের পর শিক্ষানবীশীর প্রয়োজন রইল না। তবে প্রভাব রয়ে গেল প্রধানত পাশ্চাত্য কবিদের, দ্বিতীয়ত বৈষ্ণব কবিদের। সাত আট বছর পরে এলো কালিদাসের প্রভাব। এইটেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সব চেয়ে স্থায়ী প্রভাব। আধ্যাত্মিক জীবনের দৃঢ়তম প্রভাব মহর্ষি, রামমোহন ও উপনিষদ্। কিন্তু কারো চেয়ে কম দৃঢ় নয় বাউল মার্গ।

'প্রভাতসঙ্গীতে'র বাণী বিশিষ্ট হলেও রূপ অপরিণত। 'ছবি ও গানে'র লেখাও পরিপক্ক নয়। এমন সময় তাঁর জীবনে বড় বড় দুটি ঘটনা ঘটে যায়। একটি তো তাঁর বিবাহ। অপরটি তাঁর নতুন

বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা। আনন্দ ও নিরানন্দ মিলে অচিরেই তাঁকে পাকিয়ে তোলে। এখন মনে হয় এর প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথকে নির্মাণ করতে বিধাতা আনন্দ ও নিরানন্দ উভয় উপকরণেরই অকৃপণ সদ্ব্যবহার করেছেন। কেবলমাত্র প্রতিভার সাহায্যে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। বিশ্বরূপদর্শন বেশীদূর এগিয়ে দিলেও সাহিত্যে নয়, জীবনে। জীবনের পরিণতির জন্যে চাই প্রেম, প্রীতি, বিরহ, মিলন, মান, অভিমান, শোক, দুঃখ, দ্বন্দ্ব।

'কড়ি ও কোমল' যে পরিণতির আভাস দেয় তাকে রূপবান করে 'মানসী'। কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতার নয় বাংলা কবিতার সে এক নতুন রূপ ও ধ্বনি। কিন্তু তাতেও একটি উপাদান কম পড়েছিল। উপযুক্ত পরিবেশ। জমিদারি করতে গিয়ে পদ্মানদীর তটে ও বক্ষে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর মনের মতো আকাশ ও নীড়। পরিপূর্ণ প্রকৃতি-সংসর্গ। জনগণের সান্নিধ্য। দেখতে দেখতে তাঁর প্রতিভার চার দরজা খুলে গেল। নাটক, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা চতুর্দিকে ছুটল। 'সাধনা'র যুগে তিনি চতুরাননের মতো সৃষ্টিতৎপর। এই লিখছেন 'চিত্রাঙ্গদা' তো এই লিখছেন 'সোনার তরী'। এই লিখছেন 'কাবুলিওয়ালা' তো এই লিখছেন 'পঞ্চভূত'। রামধনু-রঙা মিছিলের মতো চলেছে 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'কথা', 'কাহিনী', 'চৈতালী', 'কণিকা', 'ক্ষণিকা'। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে গল্পের পর গল্প, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ, নাটিকার পর নাটিকা।

তখনকার দিনে আরো একজোড়া হাত ছিল তাঁর। তা দিয়ে তিনি টেগোর কোম্পানীর পাট ভুষিমাল ও আখমাড়াইয়ের কারবার চালাতেন। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বল। বলেন্দ্রনাথের অকাল-মৃত্যুর পর অতিবিশ্বাসী ম্যানেজার ফেরার হলে দেখা গেল টেগোর কোম্পানীর সত্তর আশি হাজার টাকা বাজার দেনা। আইনের দিক

থেকে সমস্ত দায় ও দায়িত্ব গিয়ে বর্তাল রবীন্দ্রনাথের একার উপর। তাঁর বিষয়বুদ্ধি যেমন প্রখর ছিল তিনি ইচ্ছা করলে কারবার না গুটিয়েই কিছুদিন পরে সব দেনা শোধ করে দিতে পারতেন, কিন্তু জীবনের দিক পরিবর্তনের জন্যে তিনি ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল বোধ করছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের যা স্বধর্ম তাঁর পৌত্রের তা স্বধর্ম নয়। কারবার তো তিনি গুটিয়ে নিলেনই, জীবনকেও গুটিয়ে নিলেন। এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে নতুন জীবনের সূত্রপাত, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন, পুত্রদের সুশিক্ষার আয়োজন, তার আগে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার জন্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার পনেরো বছর বয়সে ও মধ্যমা কন্যা রেণুকার সাড়ে এগারো বছর বয়সে বিবাহ। চন্দ্রনাথ বসুকী জয়! এত বাদবিতণ্ডা ও মসীযুদ্ধের পর শ্বেতপতাকা প্রদর্শন।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ছেলেদের জন্যেই দরকার। মেয়েরা সে-বয়সে ছেলের মা হবে, তাদের জন্যে দরকার না ব্রহ্মচর্য, না বিদ্যালয়। এমনি করে স্থাপিত হলো শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়। বলেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' হলো রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের 'ব্রহ্ম-চর্যাশ্রম'। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনায় রোমান ক্যাথলিক সাধুর প্ররোচনায় আদিম হিন্দুসমাজের বর্ণাশ্রমী আদর্শ। রবীন্দ্রনাথকে ঠিকমতো বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে তাঁর সমবয়সী নেতাদের অনেকেই একই ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁদের বিচারে তখন ভারত হচ্ছে হিন্দু, আর হিন্দু হচ্ছে প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রমী আর্য, অপরিবর্তনীয়, সনাতন।

তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্বোধন হলো চল্লিশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনের বিশুষ্ক প্রান্তরে। এই পর্যায়ে কবির পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরসংসর্গ ঘটল, পূর্ববর্তী পর্যায়ের প্রকৃতিসংসর্গের মতো। কবি রবীন্দ্র হলেন ঋষি রবীন্দ্র। 'নৈবেদ্য' রচনা ইতিপূর্বেই সমাপ্ত হয়েছিল, ধীরে ধীরে লেখা হলো

'উৎসর্গ,' 'খেয়া,' 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য,' 'গীতালি,' 'বলাকা' প্রভৃতি কাব্য ও 'রাজা,' 'ডাকঘর,' 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটক। এই পর্যাযেই তিনি উপন্যাস রচনায সিদ্ধহস্ত হন। 'চোখের বালি,' 'নৌকাডুবি,' 'গোরা,' 'ঘরেবাইবে' এই পর্যাযেরই কীর্তি। আবার ছোট বড মাঝাবি সব রকমের গল্পেও তিনি নিজের রেকর্ড নিজে অতিক্রম করেন। প্রবন্ধেও তিনি এক একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন। যেমন সাহিত্যিক বিষযে তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষযে। নোবেল প্রাইজ পাওযা এই পর্যাযেবই অন্তর্গত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী খ্যাতির ফল হলো এই যে তিনি পৃথিবীর লোককে সামনে বেখে লিখতে আরম্ভ করলেন। আমার নিজের বিশ্বাস এতে তাঁর বাংলা প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত অবহেলা ঘটেছে। ইংরেজী 'ন্যাশনালিজম' ও 'পার্সনালিটি' যেরূপ উচ্চাঙ্গের রচনা 'সঞ্চয', 'পরিচয' বা 'কালান্তরে'ব রচনাগুলি সেরূপ নয।

প্রকৃতপক্ষে এই তৃতীয অধ্যাযটিকে দুই পর্বে ভাগ করা সঙ্গত। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র পূর্বে ও পবে। বাংলাব কবি হলেন বিশ্বের কবি। বাংলা ভাষার লেখক হলেন ইংবেজী ভাষার লেখক। তার পরেও যে তিনি বাংলার কবি এবং বাংলাভাষার লেখক রইলেন এ কথা অস্বীকার কববে কে? তবু সেই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে তিনি কেবলমাত্র বাঙালীর রইলেন না। বাঙালীর মনে বেশ একটু অভিমান জন্মাল। "তিনি তো জাতীযতাবাদী নন, তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী। তিনি বিশ্বপ্রেমিক। দেশপ্রেমিক নন।" এ মনোভাব কবির জীবনের চতুর্থ পর্যায়েও তাঁকে অনুসবণ করেছে।

চতুর্থ অধ্যাযের সূত্রপাত হয বিশ্বভারতীর ভিত্তিপাতের সঙ্গে। ষাট বছর বয়সে। ইতিমধ্যেই তিনি প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমী তপোবন থেকে আধুনিক ভারতের "মহামানবের সাগরতীরে" উপনীত

হয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর পত্তন হলো 'গোরা'র প্রথম দিকের আদর্শে নয়, শেষো দিকের আদর্শে। নারীকেও তাতে সমান অধিকার দেওয়া হয়। নারীর মোক্ষ বাল্যবিবাহে নয়, তার মুক্তির ইঙ্গিত 'স্ত্রীর পত্রে' ও পরবর্তী অন্যান্য রচনায় নিহিত। চতুর্থ অধ্যায়ে কবি 'শেষের কবিতাতে'ও থামলেন না, 'ল্যাবরেটরি' পর্যন্ত জের টানলেন নারীর মুক্তির। সব সময়েই তিনি সচেতন ছিলেন যে বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে বর্তমান বাংলাকে তথা ভারতকে মিলিয়ে নিতে হবে। প্রাচীনের প্রতি তাঁর টান শিথিল হয়েছিল, প্রতীচীর প্রতি টান শক্ত হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়কেও দুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ গান থেকে নাচে পৌঁছেছেন। বিশ্বভারতীর ছাত্রীদের 'নটীর পূজা'য় এর আবাহন। দ্বিতীয় পর্বে নৃত্য থেকে নৃত্যনাট্যে। 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য' এর প্রথম পদক্ষেপ। এরই মাঝখানে তিনি এক সময় ছবি আঁকতে শুরু করে দেন। ছবি আঁকার শখ তাঁর সব সময়েই ছিল, কিন্তু শেষ বয়সে এটা আর শখ নয়, সাধনা। সাধনা হলো শক্তির লীলা। শক্তিকে তদ্‌গত না করলে সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। যে পরিমাণ শক্তি চিত্রকর্মে নিযুক্ত হলো সেই পরিমাণ শক্তি সাহিত্য-কর্ম থেকে বিযুক্ত হলো। সাহিত্য সাধনায় শক্তির অনটন ঘটল। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কী প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় রয়েছে তাতে। কেমন প্রাগৈতিহাসিক তার রূপকল্পনা। চিত্রকর্মকেই তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন করেছিলেন শেষ পর্বে।

একটাকে প্রধান করলে আর একটা অপ্রধান হতে বাধ্য। কাব্য যে পূর্বের তুলনায় নির্বীর্য হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ। কবির মনে পড়ে গেল যে ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' যখন গদ্য হয়েও কবিতা তখন বাংলা 'লিপিকা'ও তাই। সাহসের অভাবে নাকি তাকে পদ্যের মতো করে

লাইন ভেঙে সাজাননি। এবার সাহস পেয়ে তিনি 'পরিশেষ' ইত্যাদিকে কথ্যভাষার গদ্যে লিখে পদ্যের মতো করে সাজালেন।* অতএব সে জিনিস কাব্য হলো। তাই যদি হবে তবে আবার পদ্যে ফিরে যাওয়া কেন? নিশ্চয় নিজের কানই বিপরীত সাক্ষ্য দিয়েছে। কাব্যের সাধনা চিত্রের সাধনার চেয়ে কম কঠোর নয়। তাকে কম কঠোর করতে বাধ্য হলে মনকে বলতে হয়, কী করব! ছবি যে আমার সব শক্তি কেড়ে নিচ্ছে। আমি যে বাধা দিতে পারছিনে। আর বাধা দেবই বা কেন? চিত্রে যা প্রকাশ পাচ্ছে কবিতায় তা পাবার নয়। কবিতা আর আমার হাত দিয়ে হবে না। যা হবে তা ছড়া বা সেই রকম কিছু। তার দাবী সামান্য।

শক্তির ও অভিনিবেশের অপেক্ষাকৃত অভাবে শেষ পর্বের সাহিত্য-কৃতি আরোহী না হয়ে অবরোহী হয়েছে। অর্থাৎ কবি আর পাহাড়ে উঠছেন না, পাহাড় থেকে নামছেন। কাব্যের দিক থেকে যে চূড়ায় তিনি উঠেছিলেন তার নাম 'পূরবী'। তেমনি নাটকের দিক থেকে চূড়ার নাম 'রক্তকরবী'। উপন্যাসের দিক থেকে শেষ চূড়া 'যোগাযোগ'। শেষ কিন্তু সর্বোচ্চ নয়। তেমনি প্রবন্ধের শেষ চূড়া 'মানুষের ধর্ম'। এর মূল কথা ইংরেজীতে ব্যক্ত হয় আগে। বল-সাপেক্ষ সাহিত্যকর্ম চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পর্বেই সারা হয়েছে। তা বলে দ্বিতীয় পর্ব অসার নয়। কোনো কোনো পদ্য বা গদ্য কবিতার উপর মগ্নচৈতন্যের প্রভাব পড়েছে। এসব কবিতা তাঁর চিত্রকর্মের শামিল। অর্থাৎ এগুলিও চিত্রকর্ম। কাব্যের বিচারে দুর্বল হলেও কবিসত্তার অপূর্ব স্বাক্ষর বহন করে এরা সার্থক।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকে আমি চার অধ্যায় বলেছি। তাঁর জীবন

* সাধু ভাষায় গদ্যে ওই জিনিস ঢালাই করে দেখুন। কবিতার illusion কতক্ষণ থাকে।

তো ছোট একখানি বই নয। কাজেই "অধ্যায়" না বলে "পর্যায়" বলা উচিত। দেখতে পাওযা যাচ্ছে বিশ বছর অন্তর অন্তর তাঁর জীবনে এক একটি নবপর্যায এসেছে। প্রাচীনকালে একেই বলা হতো আশ্রম। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, যতিব্রত। একালে আমরা ও ভাবে চিন্তা করিনে। তা হলেও বেশ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিলাইদা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে এসে তপোবনবাস কি বানপ্রস্থ নয? পঞ্চাশোর্ধ্বে না হযে ওটা চল্লিশোর্ধ্বে হযেছে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত তিনি যা করেছেন তা তপশ্চর্যাই বটে। পঞ্চাশপূর্তির পর সেই যে বিলেত আর আমেরিকা গেলেন তার পর নোবেল প্রাইজ পেযে বনে আর মন বসল না। ক্রমাগত ঘুরে বেডাতে লাগলেন অবশিষ্ট ত্রিশ বছব। প্রভাতকুমাব কবিব প্রব্রজ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিযেছেন। ভ্রমণ তাঁর বরাববই ভালো লাগত। ভ্রমণের নেশা তিনি বাল্যকালে মহর্ষিব কাছে ধবেছিলেন। পিতামহ দ্বাবকানাথই বা কম কিসে? সেকালের পক্ষে দু'দু'বার বিলেত যাওয়া ও সেই দেশেতেই মবা মস্ত বাহাদুবি। রবীন্দ্রনাথ কেবল দ্বারকানাথেব পৌত্র নন, রামমোহনের উত্তরসাধক। তার পব তিনি রবি নামটিব অধিকাবী। পৃথিবী তাঁকে পরিক্রমা না করুক, পৃথিবীকে তিনি পরিক্রমা কববেনই। আফ্রিকার উপবেও তাঁর কবিতা আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেবিকা, ইউরোপের পূব পশ্চিম—মায সোভিযেট রাশিযা, এশিযার চীন জাপান বর্মা সিযাম ইন্দোনেশিযা মালয সিংহল পারস্য ইরাক। বাকী থাকে অস্ট্রেলিয়া।

কিন্তু কেমন নিয়তি, দেখুন। সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই জন্ম, সেইখানেই মৃত্যু। পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে বলে অদৃষ্ট তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে টেনে নিয়ে গেল কলকাতায়, আমরা যতদূর জানি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অপারেশনেও তাঁর আন্তরিক সায় ছিল না,

অপরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আমরা যতদূর জানি সিদ্ধান্তটা তাঁর নয়। বিবাহের মতো অপারেশনটাও কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তিনি নিমিত্তমাত্র। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসে রবি অস্ত গেল ঠিক সেই কোণটিতেই যেখানে হয়েছিল তার উদয়। কে জানে হয়তো এর মধ্যেও কিছু সাব আছে—

"পরজন্ম সত্য হলে কী ঘটে মোর সেটা জানি
আবার আমায় টানবে ধরে বাংলাদেশের এ রাজধানী।"

তাঁর মৃত্যু যেমন বিচিত্র তার মরণের দিনকয়েক আগে লেখা শেষের কবিতাটিও তেমনি বা তার চেয়েও বিচিত্র। যৌবনের সুবিখ্যাত "অন্তর্যামী" কবিতাটিতে যাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ কী কৌতুক নিত্য নূতন, ওগো কৌতুকময়ী" তাঁকেই পরিশেষে উত্তর দিয়েছেন প্রায় অন্তিম মুহূর্তে আসন্ন মহাপ্রয়াণের পরিপ্রেক্ষিতে—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।"

কিন্তু কে এই "ছলনাময়ী"? এ কি বিশ্বপ্রকৃতি? না বিশ্ববিধাতার মোহিনী রূপ? কবির শেষ নমস্কার দেখছি সেই দেবীকে যা দেবী সর্বভূতেষু ছলনাময়ীরূপেন সংস্থিতা। মনে হয় বৈষ্ণব ধারার মতো একটি শাক্ত ধারাও কবিমানসে ফল্গুধারার মতো অন্তঃসলিলা ছিল। পরম নির্ভরের সঙ্গে এই "ছলনাময়ী'র হাতেই আপনাকে তিনি সঁপে দিলেন। দেবার সময় একটি শ্লোকের মতো করে উচ্চারণ করলেন—

"অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

একালের বাল্মীকির এই হলো সমাপ্তি শ্লোক। তাঁর আমরণ

উপলব্ধির বিশুদ্ধ নির্যাস। এর পরেও তিনি কয়েক দিন নিঃশ্বাস নিয়েছেন, দু'টি একটি কথাও কয়েছেন, বেশীর ভাগ সময় আচ্ছন্ন বা অজ্ঞান রয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবননাট্যের এইখানেই ইতি।

রবীন্দ্রনাথ জর্নাল রাখতেন না। তাঁর প্রতিদিনের চিঠিপত্রকেই তাঁর জর্নাল বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনি সাবধানী মানুষ। চিঠিপত্রে ধরাছোঁয়া দেননি। তাঁর অন্তরঙ্গ রচনা বলে যদি কিছু থাকে তবে তা একান্ত সচেতনভাবে লেখা কবিতা ও গান। তার থেকে যদি কেউ তাঁর অন্তর্জীবনের গতিবিধির সন্ধান পান তা হলেই যৎকিঞ্চিৎ পাবেন, নয়তো অত্যন্ত মুখর ঐ মহামৌনী আপনি আপনার নিগূঢ় কাহিনী বলবেন না। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' জাতীয় রচনা সব কথা নয়। তা হলে প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্রজীবনী' সব কথা হবে কী করে? এহো বাহ্য।

প্রভাতকুমার তা জানেন, তাই প্রারম্ভেই উদ্ধৃত করেছেন কবির নিজের জবানী—

"যে আমি স্বপনমূরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে!
মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতিনিমেষের ভরে
যাঁহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।"

(১৯৫৯)

হুঁশিয়ারি

পৃথিবী জুড়ে অত বড় একটা যুদ্ধ অত দীর্ঘকাল ধরে যদি না চলত তা হলে এশিয়ার এতগুলো দেশ এমন রাতারাতি স্বাধীনতা পেতো না। পেয়েছে, তার কারণ ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতি যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়েছে। দুর্বলের দ্বারা পরের রাজ্য শাসন করা সম্ভব নয়। তাই তারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এশিয়া থেকে অপসরণ করেছে।

কিন্তু ওরা দুর্বল হয়েছে বলে যে আমরা এশিয়ার লোক সবল হয়েছি তা নয়। মজ্জাগত দুর্বলতা রাতারাতি সারে না। এমন কোনো টনিক নেই যা খেলে দুর্বল মানুষের গায়ে রাতারাতি জোর হয়। এশিয়ার নবস্বাধীন দেশগুলির দুর্বলতা নানা ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। অনেকগুলি দেশেই এখন সামরিক শাসন। কোনোখানেই গণতন্ত্র নিরাপদ নয়।

ভারতের ভাগ্য ভালো যে এ দেশে স্বাধীনতার বাষট্টি বছর আগে থেকে কংগ্রেস বলে একটি সঙ্ঘ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্যশাসনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল এবং আটাশ বছর আগে থেকে সংগ্রামের পথে অথরিটি অর্জন করছিল। অন্যান্য দেশে এমন একটিও সঙ্ঘ নেই যার পিছনে এতখানি প্রস্তুতি ও অথরিটি আছে। থাকলে বর্মা, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতির এ দশা হতো না। কিন্তু এই বারো বছরে কংগ্রেসের অথরিটি বহু পরিমাণে ক্ষয় হয়েছে। ক্ষমতা যদিও প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

ক্ষমতা ও অথরিটি এক জিনিস নয়। শেষ দিনটি পর্যন্ত ইংরেজ বড়লাটের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই

তাঁর অথরিটি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। অপর পক্ষে গান্ধীজীর অথরিটি দিনে দিনে বাড়ছিল। কিন্তু শেষের দিকে দেখা গেল জিন্না সাহেবের অথরিটিও বাড়ছে। আয়ুব খাঁর ক্ষমতা জিন্নার চেয়েও বেশী, কিন্তু অথরিটি জিন্নার চেয়ে কম।

তেমনি গান্ধীজীর মতো অথরিটি জবাহরলালজীর নেই, আর-কোনো কংগ্রেস নেতার নেই। যদিও ক্ষমতা এঁদের প্রচুর। সঙ্ঘ হিসাবে কংগ্রেসের যে অথরিটি ছিল সে অথরিটি আজ ক্ষীয়মাণ। যদিও ক্ষমতা এখনো প্রভূত। অথরিটি তবু কিছু আছে জবাহরলালজীর, তাই গণতন্ত্র সচল রয়েছে। কিন্তু নিরাপদ তাকে বলব না। কারণ চতুর্দিকে ডিসিপ্লিনের অভাব।

সৈন্যদল ব্যতীত আর কারো মধ্যে যদি ডিসিপ্লিন না থাকে তা হলে ক্ষমতা একদিন সৈন্যদলের হাতেই চলে যায়। পাকিস্তানে যা হয়েছে। কিংবা সৈন্যদলের মতো কঠোর নিয়মানুগ কোনো একটি পার্টির হাতে চলে যায়। যেমন বোলশেভিকদের হাতে বা নাট্সীদের হাতে।

ফ্রান্সের মতো বনেদী গণতন্ত্রী দেশেও পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল। এর পর কি কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে? স্বাধীনতার বারো বছর পরে তাই ভরসার চেয়ে ভাবনা বেশী। উপরের দিকে অথরিটি চাই, চারি দিকে ডিসিপ্লিন চাই, সকলের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান চাই। এক যুগ পরেও লক্ষ করছি গণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রগাঢ় অজ্ঞতা।

কেরলের কথাই ধরা যাক। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও এমন দৃশ্য দেখা যায় যে শতকরা পঁয়ত্রিশ জনের ভোটে নির্বাচিত দল আইন-সভায় শতকরা একান্নটা আসন পেয়েছে। যতদিন না একান্ন কমতে কমতে উনপঞ্চাশ হয়েছে ততদিন তাকে তাড়াবার উপায় নেই। অগত্যা আইন সভার মেয়াদ না ফুরোনো অবধি ধৈর্য ধরতে হয়।

মেজরিটি বলতে বোঝায় দেশব্যাপী মেজরিটি নয়, আইন সভার মেজরিটি। এই সরল তত্ত্বটা হাইকোর্টের ব্যারিস্টারদেরও সমঝাতে হয়। তা হলে সাধারণ লোককে সমঝাব কী করে?

তার পর কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ কি আমেরিকার মতো রাষ্ট্রে হয়? এদেশে সে রকম একটা বিধান আছে বলে কি সেটা যখন তখন প্রয়োগ করা উচিত? করলে ও করতে দিলে কেন্দ্রই ক্রমে সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে। তা হলে ডেমোক্রেসী ও ডিকটেটরশিপের মাঝখানকার ব্যবধান সংকীর্ণ হয়ে আসে। ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়, কিন্তু তার ব্যবহার কদাচ কচিৎ। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ আবশ্যক হতে পারে জাতীয় সঙ্কটের দিন, যেমন যুদ্ধের সময়, গৃহযুদ্ধের সময়।

কোনো একটি রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা তাদের নির্বাচিত সরকারের উপর আস্থা হারালে নতুন করে নির্বাচনের আয়োজন করাই প্রথা। কিন্তু কেমন করে বোঝা যাবে যে অধিকাংশেরই অনাস্থা ঘটেছে, যদি না আইন সভায় তা সপ্রমাণ হয়? ইংলণ্ডে একটি প্রথা আছে, সরকারপক্ষ যদি পর পর কয়েকটা উপনির্বাচনে হেরে যান তা হলে বুঝতে পারেন যে আইন সভা ভেঙে দেবার সময় এসেছে, নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশেও সেইটেই প্রথা হওয়া উচিত। ধরুন কেরলের বিরোধী দলগুলির দশজন সদস্য যদি আইনসভা থেকে ইস্তফা দেন ও দশটি নির্বাচনকেন্দ্রে উপনির্বাচন দাবী করেন তা হলে সেসব উপনির্বাচনে সরকারপক্ষ হেরে গেলে সরকারকেই গদি ছাড়তে হবে, আইনসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হবে।

এমন একটা রাস্তা খোলা থাকতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে হয় কেন? কী এমন বেআইনী কাজ সরকার থেকে করা হচ্ছে যার প্রতিকার আদালতে মামলা করে নয়, পথে ঘাটে হামলা করে? বেআইনী কাজ

সরকার করছে কি না জানিনে, বিরোধীরা যে করছে তা তো স্পষ্ট। গণতন্ত্রে আইনভঙ্গের স্থান নেই। তবে আইন যদি বিবেকবিরুদ্ধ হয় তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের স্থান আছে। কেরলের কোন্ আইনটা কার বিবেকবিরুদ্ধ ?

গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহের প্রবর্তন করেছিলেন তখন এদেশে পার্লামেণ্টারি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। সরকারপক্ষ নির্বাচনে দাঁড়াত না। বিরোধীপক্ষ নির্বাচনে জিতলেও গদি পেতো না। তা ছাড়া এমন অনেক আইন ছিল যা গান্ধীজীর মতো লোকের বিবেকবিরুদ্ধ। তারপর সত্যাগ্রহ ও ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন এক জিনিস নয়। সত্যাগ্রহ গান্ধীজীর কীর্তি। আর ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন জিন্না সাহেবের অপকীর্তি। কেরলের আন্দোলন গান্ধীজীর পরিভাষা পর্যন্ত মানে না। গান্ধী-নীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

অসন্তোষের যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তা যদি গণতন্ত্রের কাঠামো অতিক্রম করে তা হলে গণতন্ত্র বিপন্ন। আজ কমিউনিস্ট সরকার এর লক্ষ্য, কাল কংগ্রেস সরকার লক্ষ্য হতে পারে। ক্ষমতার আসনে খারাপ লোক বসেছে বলে খারাপ উপায়ে ভাগাতে হবে, এই যদি হয় যুক্তি তা হলে খারাপ উপায়েরই সাত খুন মাফ। একদিন হয়তো ভালো লোককেও খারাপ লোক বলে অপবাদ দিয়ে খারাপ উপায়ে বিতাড়ন করা হবে।

কমিনিস্টরা হয়তো সত্যিই গণতন্ত্রের সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু আইন সভার অধিবেশন দাবী করে বিরোধীপক্ষ কি সেটার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবাদ করেছে ? আইনসভাকে অবজ্ঞা করাই যদি রীতি হয় তবে আর একটা আইনসভা নির্বাচন করে [illegible] করে [illegible] কোথায় রইল তার প্রেস্টিজ ? তা হলে গণতন্ত্র বন[illegible] যাক।

আমাদের স্বা[illegible] ঠিক পাকি[illegible] স্বাধীনতা নয়। গণতন্ত্র
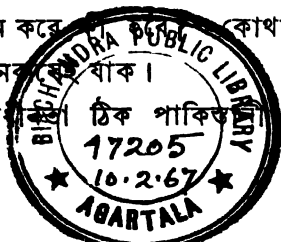
আমাদের কাছে একান্ত মূল্যবান। সে যদি বিপন্ন হয় তবে স্বাধীনতাও বিপন্ন। কমিউনিস্টদের দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা যে নেই তা নয়, কিন্তু কমিউনিস্টদেরকে এমন কোনো কুদৃষ্টান্ত দেখানো উচিত নয় যাকে নজির করে তারা পরে একদিন ক্ষমতা অধিকার করবে। তা ছাড়া প্রস্তাবিত অকালনির্বাচনে যে তাদের জয় হবে না তাই বা কে জোর করে বলবে? হলে তখন তাদের রুখতে পারবে কে?

আমরা এই মুহূর্তে এমন এক দৃশ্য দেখছি যা স্বতই গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা জাগায়। মনটাকে শক্ত করে কঠোর স্বরে বলতে হবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যতীত আর কোনো পদ্ধতি সহ্য করা হবে না। ডাইরেক্ট অ্যাকশন নিষেধ। এমন কি কংগ্রেস থেকে করলেও নিষেধ। এখন কংগ্রেসীদের যদি সামলাই তো পরে কমিউনিস্টদেরও সামলাতে পারব। নৈতিক বলে বলবান হতে হবে, দুর্বল দেশের পক্ষে এই পন্থাই শ্রেয়স্কর।'

স্বাধীনতার একযুগ পরে এমন সঙ্কটে পড়ব ভাবতেও পারিনি। অথরিটি না বাড়ালে এ রকম আরো হবে। তার জন্যে চাই ত্যাগ ও তপস্যা। এক এক সময় মনে হয় মাও ৎসে তুং যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন জবাহরলালের তা অনুসরণ: াগ্য।

(১৯৫৯)

স্বাধীনতার এক যুগ পরে

স্বাধীনতার এক যুগ পরে পিছন ফিরে তাকাচ্ছি। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি যে সেই বছরই দেশ স্বাধীন হবে, ইংরেজ তার সৈন্যদল সরিয়ে নেবে। এর পূর্বাভাষ পাওয়া গেল ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু তখনো আমরা কল্পনা করতে পারিনি যে, এই অপূর্ব ঘটনা ঘটবে সেই বছরেরই আগস্ট মাসে। অ্যাটলীর ঘোষণায় ছিল ১৯৪৮ সালের জুন মাসের সময়সীমা। সেই প্রথম লক্ষ্য করলুম যে আমরা যত না অধীর ইংরেজ তার চেয়েও অধীর।

ইংরেজ মহলে আমার আনাগোনা ছিল। দেখলুম তারা ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছে বলে একটুও কাতর নয়। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন ফাঁদে পড়ে ছটফট করছে, ফাঁদ থেকে উদ্ধার পেলে বাঁচে। ১৯৩৯ সালের সঙ্গে, এমন কি ১৯৪২ সালের সঙ্গে কত না তফাত। আমার বিশ্বাস ইংরেজের অন্তঃপরিবর্তন ঘটে ১৯৪২ সালে সিঙ্গাপুর ও বর্মা থেকে পালিয়ে এসে ভারতবর্ষের আগস্ট আন্দোলনের মুখে পড়ে। ১৯৪৩ সালে তার'জোর ছিল, কিন্তু অথরিটি ছিল না। জোর মানে তো গায়ের জোর। সৈন্যবল। ১৯৪৭ সালে দেখা গেল তাতেও ভাঙন ধরেছে। পূব দিক থেকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করছে ইংরেজেরই একদল বিদ্রোহী সৈন্য। তাদের আনুগত্য স্বদেশের প্রতি। সম্রাটের প্রতি নয়। ১৯৪৫ সালের ইংরেজ ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রস্থানের কথা ভাবছে। ১৯৪৬ সালের ইংরেজ কংগ্রেস ও লীগকে মসনদে বসিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্ত আলোচনা করছে।

সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা আকস্মিক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। আমরা যদি বলতুম যে দেশবিভাগ আমরা কোনো মতেই মেনে নেব

না তা হলে ইংরেজ আরো কিছু দিন সবুর করত, কিন্তু আরো কয়েক বছর নয়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে সে শুভযাত্রা করতই। আমাদের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এবং তার সময়সীমা অ্যাটলী কর্তৃক পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। আমরা যদি ভালোমন্দ কোনো রকম সিদ্ধান্ত না নিতুম, যদি কোনো রকম সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিজেদের ভিতরে মারামারি করে সময় কাটিয়ে দিতুম তা হলেও দেশ ছেড়ে চলে যেত ইংরেজ।

মাউণ্টব্যাটেনের কাজ হলো এই বিচিত্র অপসরণকে ত্বরান্বিত করে নেহরু পটেল প্রভৃতি নেতাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা। ইংরেজ যে স্বেচ্ছায় কোনো দিন যাবে কেউ একথা বিশ্বাস করতেন না। তার উপর আবার একদিন চাপ দিতে হবে, এটাই ছিল সর্বসম্মত ধারণা। টেবল হঠাৎ উলটে গেল কেন ও কেমন করে? গেল প্রধানত ১৯৪২ সালের অন্তঃপরিবর্তন অবলম্বন করে। দ্বিতীয়ত যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে রুশসৈন্যের মুখোমুখি মার্কিন ফরাসী ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করার প্রয়োজনে। হিটলার গেল বটে, কিন্তু স্টালিন তো আরো কাছে এলো। স্থায়ীভাবে জার্মানী অধিকার করতে হলে ভারতবর্ষের উপর অধিকার কায়েম রাখা চ'ল না। সাম্রাজ্য যদিও প্রাণাধিক প্রিয় তবু কমিউনিস্ট রাশিয়াকে নাকের ডগায় বসতে দেখলে চার্চিলের মতো লোহার ভীমেরও মতিগতি বদলায়।

দেশবিভাগে রাজী না হলেও যদি স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী ছিল তবে রাজী হয়ে কলঙ্কভাগী কেন হলুম আমরা? হলুম প্রাণের দায়ে। ইংরেজ বলল চলে যাবে। কিন্তু কাকে রাজা বলে স্বীকার করবে তা তো বলেনি। কংগ্রেসকে না লীগকে না উভয়কে না এক অংশে কংগ্রেসকে আরেক অংশে লীগকে এটা তো সে কবুল করেনি। শাহ্‌জাহান বেঁচে থাকতেই তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে ছেলেতে ছেলেতে

লড়াই বেধে গেল। ১৯৪৬ সালের কলকাতায় দাঙ্গায় যার সূচনা হয়েছিল সেটাও শাহ্‌জাহান বেঁচে থাকতেই উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই। লড়ায়ের মাঝখানে শাহ্‌জাহান মারা গেলে চার ছেলেই চার প্রান্তে নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করতেন। তেমনি কাউকেই রাজা বলে স্বীকার না করে ইংরেজ যদি দাঙ্গাহাঙ্গামার মাঝখানে একতরফা রাজ্যত্যাগ করত তা হলে বাকী দু' তরফ যে যার অধিকৃত এলাকায় নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করত। যার নাম ছিল দাঙ্গাহাঙ্গামা তারই নাম হতো রাজায় রাজায় যুদ্ধ। দু' পক্ষেই দু' দল সৈন্য। ভারতবর্ষের মাটিতে বহুকাল সৈনিকে সৈনিকে যুদ্ধ বাধেনি। নতুন একটা দৃশ্য দেখতে কোনো পক্ষেরই উৎসাহ ছিল না। কারণ দু' পক্ষই জানত কার কত দূর দৌড়। অখণ্ড ভারতবর্ষ জয় করে একচ্ছত্র হবার মতো বাহুবল কংগ্রেসের ছিল না। সারা বাংলা, সারা পাঞ্জাব জয় করে অখণ্ড পাকিস্তানের শাহান শাহ্‌ হবার মতো গায়ের জোর লীগের ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহের উপর চরমসিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলে এমনও হতে পারত যে, রাজনীতিকদের হটিয়ে দিয়ে সেনাপতিরাই অধীশ্বর হয়ে বসতেন। কিংবা তলা থেকে কমিউনিস্টরা ভুঁই ফুঁড়ে উঠত।

মাউণ্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে যে মীমাংসা হলো সেটা গৃহযুদ্ধ পরিহারের ভিত্তিতে মীমাংসা। তেমন একটা মীমাংসা যদি না হতো তা হলে দু' পক্ষ একজোট হয়ে রাজ্য চালাতে রাজী হতো না, এক পক্ষ না এক পক্ষ বড়লাটের শাসনপরিষদ্ ছেড়ে চলে যেত, বড়লাট ফাঁদে পড়তেন, মানে মানে রাজ্যত্যাগ করতে পারতেন না, অথচ কোনো এক পক্ষকে সার্বভৌম বলে স্বীকারও করতেন না। পটেল, নেহরু, জিন্না ও গান্ধী মাউণ্টব্যাটেনকে উদ্ধার করে বাঁচালেন। তাই তিনি ১৫ই অগাস্টের মধ্যে দেশ ভাগ করে দিয়ে প্রদেশ ভাগ করে দিয়ে ভীষণ এক দায়িত্বের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন।

স্বাভাবিক সময়ে আমরা দেখেছি একটা জেলা ভাগ করা কী কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চল্লিশ বছর হলো ময়মনসিংহ ভাগ করার পরিকল্পনা শিকেয় ঝুলছে। পরম পরাক্রান্ত ইংরেজ সরকারেরও সাধ্য ছিল না জনমত উপেক্ষা করে ময়মনসিংহ ভাগ করতে। বঙ্গভঙ্গ রদের পর তাদের চৈতন্য হয়েছিল যে জনমত যেখানে প্রতিকূল সেখানে শাসনকার্য সুগম হবে বলে অপ্রিয় ভাগ বিভাগ রাজনীতিসম্মত নয়। সময়টা অস্বাভাবিক বলেই দেশবিভাগ প্রদেশবিভাগ ও নদীয়া দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাবিভাগ সম্ভব হলো। এত তাড়াতাড়ি হলো যে লোকে ভাববারও অবসর পেলো না কী হচ্ছে। এ যেন কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ডাক্তারী অপারেশন। এর প্রয়োজন ছিল বলে যদি মেনে নিই তা হলে এর পরিণামকেও মেনে নিতে হয়। কিন্তু সত্যি কি এর কোনো প্রয়োজন ছিল?

বারো বছর ধরে আমি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। সম্প্রতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনী পড়লুম। তিনিও বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক যে সত্যি এর কোনো দরকার ছিল। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি মেনে নিতে রাজী হননি। তাই একে তাকে ওকে দোষ দিয়ে গেছেন। কিন্তু পাকিস্তানীদের মন ও মেজাজ দেখে কারই বা বুঝতে বাকী আছে যে বড়লাটের মধ্যস্থতায় কংগ্রেস ও লীগের রাজ্যসীমা নির্ধারিত না হয়ে থাকলে তরবারির মধ্যস্থতায় হতো! মৌলানা সাহেব ছিলেন একান্ত যুক্তিবাদী। দেশবিভাগ যখন যুক্তিসঙ্গত নয় তখন তা হবেই বা কেন? আমাদের অনেকেরই মনোভাব তাই। মানবিক ব্যাপারে যুক্তিই সব সময় নিয়ামক নয়। তা যদি হতো প্রথম মহাযুদ্ধ বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধত না। তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধি বাধি করত না। ১৫ই আগস্টের দিন সাতেক আগে আমি ময়মনসিংহ থেকে হাওড়ায় বদলি হই। ইচ্ছা করলে দিন সাতেক

পরে ময়মনসিংহ ছাড়তে পারতুম। তা হলে কিন্তু পাকিস্তানের পতাকাকে সেলাম করতে হতো। কী! পাকিস্তানের চাঁদতারাকে সেলাম করব! কক্ষনো না। কই, ইউনিয়ন জ্যাককে সেলাম করতে তো বাধেনি? পাকিস্তানের চাঁদতারায় আমার যে আপত্তি ভারতের ধর্মচক্রে লীগপন্থী মুসলমানদেরও সেই আপত্তি। পুর্বপাকিস্তানের বর্তমান গভর্নর আমার বন্ধু জাকির হোসেন সাহেব উনিশ কুড়ি বছর আগে আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর পাকিস্তান চাওয়ার মূলে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতে আপত্তি। কই, "গড সেভ দি কিং" সঙ্গীতে তো আপত্তি শুনিনি?

হিন্দু মুসলমানের স্বার্থের বিরোধ সর্বগ্রাসী নয়। অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তার স্থিতি। ধর্মের বিরোধও কুরুক্ষেত্র বাধাবার মতো নয়। অতীতে বাধেনি। কিন্তু মেজরিটির কাছে ভয়ে হাত জোড় করে থাকতে মাইনরিটির অনিচ্ছা অত্যন্ত গভীর। অত্যন্ত তীব্র। এ অনিচ্ছা যেমন আমার তেমনি জাকির হোসেনের। কেমন করে মাইনরিটির মন পেতে হবে, হৃদয় পেতে হবে, তার মীমাংসা এখনো হয়নি। ভয় দেখিয়ে যে হবে না এটা নিশ্চিত।

নতুন ভারতের সংবিধানে কেউ মেজরিটি নয়, কেউ মাইনরিটি নয়। আমাদের এটা সেকুলার স্টেট। কিন্তু লোকের মানসিক অভ্যাস এখনো বদলায়নি। এখনো হিন্দুরা ভাবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, মুসলমানরা ভাবে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। হিন্দুদের ধারণা মুসলমানদের ন্যায়ত এ রাষ্ট্রে কোনো অধিকার নেই, হিন্দুদের অনুগ্রহেই তারা আছে। মুসলমানদেরও সেই আশঙ্কা। সাহস করে তারা দাবী করতে পারছে না যে তারাও স্বত্ববান নাগরিক, তাদেরও সমান স্বত্ব। 'সমান' কথাটা গাণিতিক অর্থে নয়। ওদিকে পাকিস্তানেও একই সমস্যা। এই বারো বছরেও সেখানকার হিন্দু স্বত্ববান হলো না, সমান

হওয়া তো দূরের কথা। সেখানকার মুসলমান বিশ্বাস করে যে পাকিস্তান হিন্দুর জন্যে নয়। হিন্দু যদি থাকে তো নিচু হয়ে থাকবে।

সামনের দিকে যখন তাকাই তখন এই সমস্যাটারই একটা সমাধান খুঁজি। পাকিস্তানকেও সেকুলার স্টেট হতে হবে। ভারতের হিন্দুদের কার্যত সেকুলার-মনস্ক হতে হবে। পাকিস্তানের মুসলমানদের কার্যত সেকুলার-মনস্ক হতে হবে। এটা এক আধ বছরের ব্যাপার নয়। বোধ হয় এক আধ পুরুষের মামলা। পশ্চিম পাকিস্তানে আরো দীর্ঘকালের। বোধ হয় এক আধ শতাব্দীর। বাসনাপূর্ণ চিন্তা দিয়ে সময়সংক্ষেপ হবে না। হলে হবে হিন্দু মুসলমানের অন্তর্নিহিত প্রেম দিয়ে। বাহ্য ঘটনার অন্তরালে প্রেমের অন্তঃসলিলা ফল্গুও প্রবাহিত হচ্ছে। সকলের চোখে পড়ে না। স্বার্থান্ধদের চোখে তো নয়ই। পূর্বপাকিস্তানের অন্তর যদি সেখানকার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে তবে ইতিমধ্যেই অনেকটা অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ চিরকাল আলাদা থাকা পছন্দ করে না। আলাদা থাকলে তার ভিতরকার রস শুকিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গেও রসের কমতি দেখছি।

মেজরিটি মাইনরিটির ঝগড়া ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এ ঝগড়া আগে আমাদের দেশে বাধত, যদি ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকত বা পড়ত। ইংরেজই এর সূত্রধার নয়। তবে ইংরেজ এতে প্রশ্রয় দিয়েছে ও একে জটিল করেছে। এই বারো বছরে ইংরেজের উপর বিরূপভাব আমার মন থেকে মুছে গেছে। পৌনে দু'শো বছরের ইংরেজ শাসনের কথা যখন ভাবি তখন ইংরেজকে মনে হয় আধুনিকতার বাহন। আপনার ইচ্ছায় বা চেষ্টায় এ দেশ আধুনিক হতো না। তিব্বত বা নেপালের মতো মধ্যযুগেই অবস্থান করত। ঐক্যেরও বিধাতা ইংরেজ। এই বিরাট দেশ স্বেচ্ছায় ও স্বচেষ্টায় এক হতো না। বড় জোর দ্বিখণ্ড বা ত্রিখণ্ড হতো। আমরা জন্ম থেকে

দেখে আসতুম যে দেশ বিভক্ত। তার পর গণতন্ত্রের প্রবর্তকও ইংরেজ। গণতন্ত্র এ দেশে নির্বিরোধে বিবর্তিত হতো না। মিলিটারির উপর সিভিলের ঘোড়সওয়ারিও ইংরেজের প্রবর্তন। আইনের রাজত্বও তারই। পরাধীনতার নিষ্ক্রয় দিয়ে আমরা অনেক মূল্যবান সামগ্রী লাভ করেছি। এসব রাখতে জানলে হয়।

(১৯৫৯)

সূর্যগ্রহণ

কালে কালে কত দেখব! ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে একদল লোক ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন শুরু করে দেয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা যায় তাদেরি জেদ জয়ী হয়েছে। দেশ ভেঙে ছু'খানা হয়েছে। ১৯৫৯ সালের জুন মাসে আরেক দল লোক ডাইরেক্‌ট অ্যাকশনে নামল। ছু'মাস যেতে না যেতেই দেখা গেল তাদেরি জেদ জয়ী হয়েছে। একটি রাজ্যের আইনসভার সংখ্যাগুরু দলের শাসন রদ হয়েছে। আইনসভা থাকলে আবার সেখানে তারা সংখ্যাগুরু হতে পারত, তাই আইন-সভাকেও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচকদের রায়টাকে সরাসরি উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা হলে ডাইরেক্‌ট অ্যাকশনকে ইংরেজীতে থ্রী চীয়ার্স দিতে হয়। থ্রী চীয়ার্স ফর ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন। হিপ হিপ হুরে।

ই. এম. ফর্স্টার তাঁর দেশের ডেমোক্রেসীকে থ্রী চীয়ার্স দিতে পারেননি। টু চীয়ার্স দিয়েছেন। আমি আমার দেশের ডেমোক্রেসীকে ওয়ান চীয়ারও দিতে পারছিনে। কারণ থ্রী চীয়ার্সের তিনটিই তো ডাইরেক্‌ট অ্যাকশনকে দিতে হচ্ছে।

দেশ যখন গণতন্ত্র ছিল না তখন নিরস্ত্র দেশবাসীর হাতে গান্ধীজী একটি অস্ত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অস্ত্রটি অহিংস। তার নাম সত্যাগ্রহ। বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে সত্যাগ্রহ করাই ছিল তাঁর পদ্ধতি। প্রতিপক্ষের সঙ্গে মিটমাট ও মিলনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সত্যাগ্রহী সর্বদাই আলাপ আলোচনা চালাতে প্রস্তুত। নিমন্ত্রণ জানালে সে প্রত্যাখ্যান করে না। হৃদয় জয় করার জন্যেই তার অভিযান। অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে পারলেই সে জিতল, নয়তো নয়।

কোথায় ডাইরেক্‌ট অ্যাকশনের নিন্দাবাদ শুনব! না শুনতে হলো তার জিন্দাবাদ। গণতন্ত্র যে দেশে চলবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামও সেই দেশে চলবে, ভালো টাকা যে বাজারে চলবে খারাপ টাকাও সেই বাজারে চলবে, গ্রেশামের আইনে এমন কথা বলে না। দুটোকেই চলতে দিলে খারাপ টাকা ভালো টাকাকে তাড়িয়ে দেবেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম গণতন্ত্রকে দেশছাড়া করবেই। আপাতত রাজ্যছাড়া করেছে। আগামী নির্বাচনের পর দরকার হলে আবার রাজ্যছাড়া করবে।

অবশ্য কমিউনিস্টরাও সুবোধ নয়। তারা কি জানত না যে ক্যাথলিকদের পিছনে বিশ্ব ক্যাথলিক সঙ্ঘ রয়েছে? ক্যাথলিকদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে এই তো সেদিন আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি পেরন গেলেন হেরে। ক্যাথলিকদের উপর গুলী চলেছে বার বার তিন বার। তখন থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি যে কমিউনিস্ট সরকারের আর রক্ষা নেই। দু'দিন আগে হোক পরে হোক এই রক্তপাতের জন্যে দায়ী করা হবে তাঁদের। যেমন করেই হোক বিদায় দেওয়া হবে তাঁদের।

সংবিধান মতে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করার কথা গভর্নরের। কিন্তু একদল মন্ত্রীকে বরখাস্ত করলে আর একদল মন্ত্রী নিযুক্ত করতে হবে তাঁকে। তিনি যদি জানতেন যে কেরলের আইনসভার আস্থাভাজন আর একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা সম্ভব তা হলে তিনি হয়তো এতদিনে

কমিউনিস্টদের বিদায় দিয়ে তাদের প্রতিপক্ষদের হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে থাকতেন।

গভর্নর তা পারলেন না। অগত্যা রাষ্ট্রপতিকেই হস্তক্ষেপ করতে হলো। সংবিধান মতে রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করতে পারেন কখন? প্রথমত, যখন দেশ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে কিংবা যখন দেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় কিংবা যখন দেশ বা দেশের একাংশ অন্তর্বিক্ষোভে জর্জরিত হয়। এরূপ স্থলে তিনি সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে ঘোষণাপত্র জারী করতে পারেন। তার পর ৩৫৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনমতো হুকুম দিতে পারেন ও নিজেদের কর্মচারী দিয়ে রাজ্য সরকারের কাজ করিয়ে নিতে পারেন। এখানে লক্ষণীয় রাজ্য সরকারের কতক ক্ষমতা যাবে, কিন্তু রাজ্য সরকার যাবে না। মন্ত্রীরা থাকবেন। আইনসভাও থাকবে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করতে পারেন যখন এমন এক পরিস্থিতির উদয় হয়েছে বলে জানতে পান যে-পরিস্থিতিতে সংবিধানের বিধান অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঘোষণাপত্র জারী করতে পারেন। তখন তিনিই রাজ্যসরকারের যাবতীয় ক্ষমতার মালিক। মন্ত্রীরা থাকবেন কি না তিনিই স্থির করবেন। আইনসভা থাকবে কি না সেটাও তাঁর বিবেচনাসাপেক্ষ। নির্বাচনের ইঙ্গিত যদিও কোথাও নেই তবু আইনসভা না থাকলে নির্বাচনের প্রয়োজন আপনি এসে পড়ে।

এমারজেন্সীর এই দুই প্রকার ব্যবস্থা পাশাপাশি ধরে বিচার করলে বোঝা যায় কেরলের আভ্যন্তরিক বিক্ষোভের জন্যে ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োজ্য নয়, বরং ৩৫২ অনুচ্ছেদই প্রযোজ্য। আভ্যন্তরিক বিক্ষোভের লেশমাত্র সঙ্কেত ৩৫৬ অনুচ্ছেদে নেই। আগেও যতবার এই অনুচ্ছেদ

অনুসারে কাজ করা হয়েছে আভ্যন্তরিক বিক্ষোভের প্রশ্ন ওঠেনি। মন্ত্রীদের উপর থেকে আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থা চলে না গেলে এবং আস্থা চলে যাওয়ার গণতন্ত্রসম্মত প্রমাণ না পেলে তাদের বিদায় করে দেওয়া সংবিধান রচয়িতাদের অভিপ্রেত নয়, সংবিধানের স্পিরিট নয়। আইনসভার উপর থেকে অধিকাংশ নির্বাচকের আস্থা উঠে না গেলে ও আস্থা উঠে যাওয়ার গণতন্ত্রসম্মত প্রমাণ না পেলে তাকে বাতিল করে দেওয়াও সংবিধানরচয়িতাদের অভিপ্রেত নয়, সংবিধানের স্পিরিট নয়। তবে স্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা যদি কিছুতেই সম্ভব না হয় রাজকার্যে শৈথিল্য আসবেই, শাসকযন্ত্র বিকল হবেই, কাউকেই দায়ী করতে পারা যাবে না, একদল মন্ত্রী আরেক দল মন্ত্রীকে দোষ দিয়ে নিজেরা খালাস হতে চাইবে। আইনসভা যদি স্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সহায়ক না হয় তা হলে তাকে বাতিল করাই উচিত। তখন নির্বাচকদের কাজ হবে স্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনে সাহায্য করা।

কেরলের পরিস্থিতি কিন্তু এরূপ নয়। স্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডলী আড়াই বছর ধরে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, আরো আড়াই বছর নিতে তৈরি। আইনসভাও অস্থিরমতি নয়, স্থিরমতি। তা হলে নির্বাচকদের সাহায্যের প্রয়োজন কী ও কেন? মেয়াদ পূর্ণ হোক আগে। বাইরে একদল লোক অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে বলে যদি রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে থাকে তবে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে এমারজেন্সী ঘোষণা করতে পারতেন। তা হলে মন্ত্রীরাও টিকে যেত, আইনসভাও টিকে যেত, অথচ ইউনিয়ন সরকারের শাসনে অরাজকতা রোধ হতো। দেখে শুনে মনে হয় যে মন্ত্রীরা টিকে থাকুক এটা উদ্দেশ্য নয়, মন্ত্রীরা যাক এইটেই উদ্দেশ্য। সম্ভবত তারা টিকে থাকলে বিমোচন সমর সমিতির রাগ পড়ত না, ডাইরেক্ট অ্যাকশন বন্ধ হতো না, কেরল সরকারের বন্দুক কেড়ে নিয়ে ভারত সরকারকেই গুলী

চালাতে হতো। কেন তাঁরা পরের স্বার্থে গুলী চালিযে নিজেরা অপ্রিয় হবেন? তার চেয়ে ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করলে হয়।

রাজনীতির দিক থেকে হয়, কিন্তু নিয়মের দিক থেকে হয় না। যে খেলার যে নিযম। ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন করল বিমোচন সমর সমিতি। অর্ধেক পরমায়ু গেল নম্বুদিরিপাদ মন্ত্রীমণ্ডলীর ও কেরল আইনসভার। নির্বাচকদের বিনা দোষে তাদের রায ওলটাল। হিংসার কাছে আপীল করলে যদি রায় ওলটায় তবে এখন থেকে লোকে আইনকানুনের ধার ধারবে না। গুটি কতক মানুষকে পুলিশের উপর লেলিয়ে দেবে, পুলিশ যেই গুলী চালাবে অমনি দিল্লীতে গিয়ে দরবার করবে, মন্ত্রীদের তাড়াও। অমনি মন্ত্রীরা বরখাস্ত হবে, আইনসভা বাতিল হবে। এটা রাজনীতি হতে পারে, সংবিধাননির্দিষ্ট মূলনীতি বা খেলার নিযম নয়। হস্তক্ষেপ হয়তো অনিবার্য ছিল, কিন্তু ৩৫৬ অনুসারে নয়, ৩৫২ অনুসারে।

হ্যারল্‌ড ল্যাস্কি একবার বলেছিলেন, ইংলণ্ডের ভদ্রলোকরা দরকার হলে খেলার নিযম পালটাতে পারেন। তা শুনে রক্ষশীলদের কী রাগ! ল্যাস্কি বেঁচে থাকলে এখন হয়তো বলতেন, ভারতের ভদ্রলোকরাও খেলার নিয়ম বদলাতে পারেন। তা শুনে কংগ্রেস নেতাদেরও রাগ হতো। কিন্তু কথাটা উঠবেই। ইংলণ্ডে দেখা যায় সরকারপক্ষ যখন একটার পর একটা উপনির্বাচনে হেরে যান তখন ধরে নেন যে সাধারণ নির্বাচনের দিন আগত ঐ। সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ফেলেন। তাঁরাই কেযারটেকার হয়ে নির্বাচন ঘটান। এই হলো গণতন্ত্রের ঐতিহ্য। কোথা থেকে কমিউনিস্টরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বলে যদি এই ঐতিহ্য অগ্রাহ্য করা হয় তবে গণতন্ত্রই তার মহত্ত্ব হারাল। কমিউনিজমের কী! তার ভিন্ন ঐতিহ্য।

যেখানে গণতন্ত্রের জীবনমরণের প্রশ্ন সেখানে কিসে আপাতত সুবিধা সেটা বড় কথা নয়। কারণ গণতন্ত্র দুর্বল হলে ডিকটেটরশিপ

তার ঘাড় মটকাবে। আমরা যদি নিজেদের ভুলে ডিকটেটরশিপের দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে থাকি তো সে ভুল শোধরাতে হবে, সে পদক্ষেপ প্রত্যাহার করতে হবে। নয়তো ভারতে ডিকটেটরশিপের যত দেরি আছে ভেবেছিলুম তত দেরি নেই। এ রকম সঙ্কট আরো গোটা কয়েক ঘনালেই এবার যা যা করা হয়েছে তাতে কুলোবে না, বিশেষ বিশেষ পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। পাছে তারা নাম ভাঁড়িয়ে নির্বাচনে দাঁড়ায় সেই ভয়ে নির্বাচনব্যবস্থার রদবদল করতে হবে। সম্প্রতি ফরাসী দেশে দ্য গল যা করলেন। তাঁর অবর্তমানে রণপতিরাই এর সুযোগ নেবেন।

কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। একদল বিশ্বাস করেন যে পার্লামেণ্টারি ক্রিকেট খেলায় তাঁদের স্থান আছে,তাঁরা আপাতত বল করতে পারেন,যথাকালে ব্যাট ধরতে পারেন। আরেকদল বলেন, ক্ষেপেছ? ওটা হলো বুর্জোয়াদের নিজস্ব খেলা। তোমাদের হাতে ব্যাট পড়বে দেখলে ওরা নিয়মকানুন বদলে দেবে।

পঞ্চাশ বছর কাল সাধনা করেও প্রথমোক্ত দল ব্যাট হাতে পেলো না। কোনো মতে নাম ভাঁড়িয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রাট টিকিটে পার্লামেণ্টে গিয়ে বল করার অধিকার পেলো। তখন লেনিন দেখিয়ে দিলেন কেমন করে সরাসরি ক্ষমতা আত্মসাৎ করতে হয়। লেনিনের ধারাই এ যাবৎ চলে আসছিল। সে ধারার পরিবর্তন আনলেন বিশ্ব কমিউনিজমের ইতিহাসে কেরলের নম্বুদিরিপাদ। সেটা অবশ্য ভারতের সংবিধানের কল্যাণে। এতে বিশ্ব গণতন্ত্রেরও মর্যাদা বাড়ল। সেই ঐতিহাসিক পরিবর্তন যে এত ক্ষণস্থায়ী হবে কে তা অনুমান করেছিল? আমাদের আনন্দের কারণ ছিল এই যে আমরা শ্রেণীসংগ্রামের রক্তরাঙা মার্গ থেকে কমিউনিস্টদের নিবৃত্ত করে গণতন্ত্রের খেলায় তাদের জন্যেও ঠাঁই করে দিয়েছি।

এই সঙ্কটে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে কমিউনিস্টদের গণতন্ত্রের খেলা খেলতে দেব কি দেব না। খেলতে দেব না, এই যদি হয় চিন্তার ফল তবে খেলার নিয়ম পালটাতে হবে। কেউ কেউ ইতি-মধ্যেই ধুয়ো ধরেছেন যে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। বাস্তবিক, ৩৫৬ অনুচ্ছেদ ঠিক খাটে না। আর ৩৫২ অনুচ্ছেদ খাটলেও রাজনীতির দিক থেকে অসমীচীন হতে পারে। কিন্তু সংবিধান যদি সংশোধিত হয় তবে সেটা আর গণতান্ত্রিক বলে বিশ্বের সর্বত্র গণ্য হবে না। আমাদের তখন গৌরব করবা'র কিছু থাকবে না। আমরা প্রায় আয়ুব খাঁর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছব। ডিকটেটরশিপের আধ রাস্তায়। খেলতে দেব, যেমন এতদিন দিয়ে এসেছি, এই যদি হয় সিদ্ধান্ত তবে যতদিন না ওদের দিক থেকে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের অনুরোধ আসছে ততদিন ৩৫৬ অনুচ্ছেদ ব্যবহাব করা চলবে না। চলতে পারে ৩৫২ অনুচ্ছেদ, সেটা ওরা চা'ক বা না চা'ক। না চাইলে পদত্যাগ করতে পারে। কিন্তু যে সবকাব ডাইরেক্ট অ্যাকশন দমন করতে নিযুক্ত তাকে দমন করলে ডাইরেক্ট অ্যাকশনকেই জিতিযে দেওযা হয়। তারপর হযতো ডাইরেক্ট অ্যাকশন বন্ধ হবে, কিন্তু সেটা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলে। অন্যায উপাযে অন্যায উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এর মতো খারাপ নজীর আর কী আছে?

আমাদের গণতান্ত্রিক বিবর্তন ব্যাহত হলো। আমরা ভিতরে ভিতরে নাড়া পেলুম, দুর্বল হযে গেলুম। একবার যে বাঘ রক্তের স্বাদ পেযেছে সে আবার চাইবে, কেরল ক্রমে শাসনের অযোগ্য হযে উঠবে। যারা জিতল তারা ভিন্ন আর কেউ তাদের শাসন করতে পারবে না। অপরপক্ষে তারাই যদি শাসক হয় তবে অন্যাযের ষোলকলা পূর্ণ হবে। তখন কমিউনিস্টরা যদি ডাইরেক্ট অ্যাকশন করে তা হলে কেউ তাদের নিন্দাবাদ করবে না, অথচ রাষ্ট্রপতি যদি ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ না

করেন সবাই তাঁর দোষ ধরবে। তবে কি ৩৫৬ই কেরলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? তাই বা কেমন করে হবে? বাধ্য হয়ে কেরলকে মাদ্রাজের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। কিন্তু মাদ্রাজ যদি রাজী না হয়? এ সমস্যা সমাধানের অতীত, যদি না কেরলীয়দের নিজেদের স্বমতি হয়। মীমাংসার স্থত্র তাদেরকেই আবিষ্কার করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদেরও কিছু বলা যেতে পারে। তাঁরা যদি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে গণতন্ত্রই ভারতের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তা হলে গণতন্ত্রের সঙ্গে যা বেখাপ তাকে ত্যাগ করতে হবে। ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন নিশ্চয়ই বেখাপ। ফ্যাসিস্টরা করলেও বেখাপ, কমিউনিস্টরা করলেও বেখাপ। কমিউনিস্টরা যদি গায়ের জোরে ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন চালিয়ে যান ফাসিস্টরাও তাই করবে। ভারতের মাটিতে গণতন্ত্র শুকিয়ে গেলে তার স্থান নেবে কমিউনিস্ট ও ফাসিস্ট দুই মহীরুহ। ভারতের মাটি যে রকম তাতে ফাসিস্টের সঙ্গে কমিউনিস্টের লড়াই বাধলে ফাসিস্ট জিতবে। গণতন্ত্র থাকলে তো তাদের নিবৃত্ত করবে! জার্মানীর সঙ্গে ভারতের সাদৃশ্য আছে। জার্মানীতে যখন কাইজার-তন্ত্রের অবসান হয় তখন সকলে ধরে নিয়েছিল যে এইবার থেকে গণতন্ত্রই সে দেশের নিয়তি। কিন্তু বাইরের আকাশে সোভিয়েট ধূমকেতুর ক্রমবর্ধমান তেজ ও ঘরের কোণে ঘরভেদী বিভীষণের ক্রম-বর্ধমান তৎপরতা দেখে জার্মানদের বুকের রক্ত মাথায় ওঠে। গণতন্ত্র যাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল তাঁরা ঠিক ব্যালান্স রাখতে পারলেন না। তাঁদের কমিউনিস্টভীতি যত প্রবল ছিল গণতন্ত্রপ্রীতি তত প্রগাঢ় ছিল না। নাট্‌সীরা জানত যে গণতন্ত্র দুর্বল হলে দেশের সেন্টিমেণ্ট তাদেরি জিতিয়ে দেবে, কমিউনিস্টদের নয়। আর কমিউনিস্টরা মার্কস্‌ মুনির শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত বলে জেনে এসেছে, দেশের লোকের নাড়ী টিপতে শেখেনি। তাই হিটলার যা চায় তাই করে

বসল। গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দিল। লাভ হলো নাৎসীদের। ভারতেরও মাথার উপর তিব্বত জুড়ে বসে আছে কমিউনিস্ট চীন, ঘরে যদি কমিউনিস্টরা উপদ্রব বাধায় ভারতীয়দেরও বুকের রক্ত মাথায় উঠবে। গণতন্ত্র তো যাবেই, কমিউনিজমও টিকতে পারবে না। ফাসিজম নিষ্কণ্টক হবে। এ দেশেও কমিউনিস্ট ভীতি যে পরিমাণ সত্য গণতন্ত্রপ্রীতি সে পরিমাণ সত্য নয়।

দ্বিতীয়ত, কেরল মন্ত্রীমণ্ডলীর ধারণা ছিল না এক একটি গুলীর কত দাম। ক'টাই বা গুলী খরচ হয়েছে কেরলে, তবু যে ক'টা হয়েছে সে ক'টাই সংখ্যালঘু ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে অত্যধিক। বাইশ বছর আগে কংগ্রেস যখন বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব নেয় গান্ধীজী নিষেধ করে দিয়েছিলেন গুলী চালাতে। তবু মুসলমানদের উপর বাধ্য হয়ে গুলী চালাতে হয়। সেসব গুলী লাগল জিন্না সাহেবের কাজে। কংগ্রেস স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে চলে না গেলে তিনিই বিমোচন সমর শুরু করতেন বছর কয়েকের মধ্যে, তখন আরো গুলী চালাতে হতো। তাতে বিমোচন সমর আরো জোর পেতো, শেষে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে বরখাস্ত করে শান্তিরক্ষা করতেন। আইনসভায় কংগ্রেসের অনেক বেশী ভোটের সংখ্যাধিক্য, তা সত্ত্বেও কংগ্রেস ইংরেজের মন বুঝে জিন্না সাহেবের মেজাজ বুঝে মুসলমানদের নাড়ী বুঝে মানে মানে আগেভাগে সরে গেছে ও সাড়ে ছ'বছর বনবাসে কাটিয়েছে। ফিরে এসেও কি শান্তিতে রাজত্ব করতে পারল! বিমোচন সমরের সম্মুখীন হয়ে রাজত্বের একাংশ ছেড়ে দিয়ে সংখ্যাধিক্য ভোগ করার অধিকার ও গুলী চালনার অথরিটি পেলো। আগামী নির্বাচনের পরে কমিউনিস্টরা সংখ্যাগুরু হলেও গুলী চালাতে গিয়ে বিপদে পড়বে। ভোটের জোরে সরকার চালানো এক কথা, গুলী চালানো অন্য কথা।

(১৯৫৯)

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে

('জয়শ্রী' সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে লিখিত পত্র)

সম্প্রতি আমি স্থির করেছি যে রাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ লেখা আর নয়। সুতরাং আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারছিনে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে যা বলবার ছিল চিঠিতেই বলছি।

গণতন্ত্রের দুই পক্ষ। সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ। বিরোধী পক্ষও একদিন সরকার পক্ষ হতে পারে। সরকার পক্ষও বিরোধী পক্ষ হতে পারে। সেইজন্যেই গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বারণ। বিরোধী পক্ষ যদি সরকারকে সরাতে চায় তবে আইন সভার ভিতরে অনাস্থা প্রস্তাব আনে, আইনসভার বাইরে উপনির্বাচনে নামে। ফলাফল যদি সরকারের বিরুদ্ধে যায় সরকার পদত্যাগ করে। সরকার পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার সাধারণ নির্বাচন নাও হতে পারে। হয় কখন? না যখন স্পষ্ট বোঝা যায় আইনসভায় বিরোধী পক্ষ সরকার গড়তে পারার মতো শক্তি রাখে না। সরকার পক্ষও রাখে না। কোনো পক্ষই রাখে না।

আইনসভার আস্থাভাজন সরকারকে বরখাস্ত করার অধিকার ইংলণ্ডের রাজারও আছে। কিন্তু সে অধিকার তিনি প্রয়োগ করেন না এই ভয়ে যে আবার যদি ওই দলটাই সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয় তবে রাজার মান থাকে না। রাজাকে সেইজন্যে ভালো করে বাজিয়ে দেখতে হয় রাজার হুকুমটা প্রজাদেরও হুকুম কি না। প্রজারা তাঁর মুখ রক্ষা করবে কি না। বস্তুত ক্ষমতাপ্রিয় ইংরেজ রাজাদের ক্ষমতা যে খর্ব হয়েছে তা সংবিধান বলে নয়। তা প্রজাশক্তির সঙ্গে সমঝোতার ফলে। নইলে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র লোপ পেতো। লোপ পেয়েওছিল ক্রমওয়েলের সময়।

আইনসভার আস্থাভাজন সরকারকে বরখাস্ত করা একটা সাংঘাতিক নজীর। প্রজাদের আস্থাভাজন আইনসভাকে বাতিল করা তো আরো সাংঘাতিক। অর্ধেক মেয়াদ বাকী থাকতে নির্বাচন ঘটিযে প্রজাদের রায় নেওয়া হবে, এ কথা ইংলণ্ডের রাজা বললেও লোকে শুনবে না। লোকে জানতে চাইবে কে ঠিক। রাজা ঠিক না সরকার ঠিক। ভারতে প্রজারা এখনো গণতন্ত্রে কাঁচা, তাই এরকম একটা ব্যাপার আদৌ সম্ভব হলো। এখন দেখতে হবে আগামী সাধারণ নির্বাচন যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়। যাতে কেউ বলতে না পারে যে বরখাস্তের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখার জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বা নির্বাচকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই গণতন্ত্রের ভিত্তিপাথর। সে পাথর আলগা হলে গণতন্ত্রের রক্ষা নেই। পতন অনিবার্য। কমিউনিস্টদের দূর করার জন্যে গণতন্ত্রের পাট ভুলে দিতে হবে, এ কথা এখনো কেউ মুখ ফুটে বলেননি, কিন্তু অনেকেরই এটা মনের কথা। তাঁরা কমিউ-নিজমের শত্রু, কিন্তু গণতন্ত্রের মিত্র নন। কিংবা কপট মিত্র।

ভারতের গণতন্ত্র এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে পৌছেছে যখন রাজ্য সরকারের ইজ্জৎ নেই, আইনসভার ইজ্জৎ নেই, ইজ্জৎ আছে শুধু নির্বাচক সাধারণের। আবার হয়তো বছর দুই পরে তাদের রায় উলটিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে, আবার নির্বাচন চাই। তখন তাদেরও ইজ্জৎ থাকবে না। ইজ্জৎ যদি না থাকে ঠাট বজায় রেখে কী হবে? কেবলমাত্র ঠাট দিয়ে দেশ শাসন করা যায় না। ইংরেজ সরকারও বিস্তর ঠাট ছিল, কিন্তু যেই ইজ্জৎ চলে গেল আমনি ওরাও চলে গেল। ইজ্জৎকে খাটো করতে দিতে নেই। হলোই বা সরকারটা কমিউনিস্ট পার্টির। কেরলে যা ঘটেছে তাতে কংগ্রেসী সরকারেরও ইজ্জৎ খাটো হয়েছে। সব রাজ্যের সব আইনসভার ইজ্জতে লেগেছে।

ইংরেজকে হটানোর জন্যে একদা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। গান্ধীজী তাকে শুদ্ধ করে তার নাম রেখেছিলেন সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের লক্ষ্য প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্তন। একবার যদি অন্তঃপরিবর্তন ঘটে তখন প্রতিপক্ষ আর প্রতিপক্ষ নয়। তখন সেও সহযোগিতা করে। সেইভাবে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়। গান্ধীজী ইংরেজের অবমাননা চাননি, তাই মাঝে মাঝে সত্যাগ্রহ স্থগিত রেখে কথাবার্তা চালিয়েছেন। এমন অসম্ভব জেদ তাঁর ছিল না যে বলবেন, আগে তোমরা পদত্যাগ কর, তার পর তোমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করব। ইচ্ছা করলেই তিনি রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। তা তিনি করলেন না প্রতিপক্ষের সম্মান রাখতে। শেষ দিনটি পর্যন্ত কথাবার্তা চালিয়ে তার পরে তিনি সত্যাগ্রহ ঘোষণা করতেন। তার মাঝখানেও কথাবার্তা চালাতেন।

একেবারে অন্য জিনিস জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পদ্ধতি। কংগ্রেসকে, গান্ধীকে পদে পদে অপমান করেছেন তিনি। বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। মীমাংসা যা হলো তা সাক্ষাৎ আলোচনার দ্বারা নয়। মধ্যস্থ মারফত। কেরলেও সরকার পক্ষের সঙ্গে বিরোধী পক্ষের বাক্যালাপ বন্ধ। নির্বাচনের পরেও কি বাক্যালাপ বন্ধ থাকবে? তাই যদি হয় তবে মেলামেশার অভাবে মীমাংসার পথ রুদ্ধ হবে। আবার সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সম্ভবত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরো অশুদ্ধ রূপ নেবে। পরের বার আর পুলিশ বনাম জনতা নয়, জনতা বনাম জনতা।

আসলে হয়েছে এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের ঝগড়ার মতো কমিউনিস্টদের সঙ্গে অন্যান্য দলের ঝগড়াটাও ফাণ্ডামেণ্টাল। ঝগড়া করতে করতে যেমন একদিন দেশ ভেঙে গেল তেমনি একদিন গণতন্ত্রও ভেঙে পড়বে। সেইজন্যে কখনো কথাবার্তা বন্ধ করতে নেই। নির্বাচনের চেয়ে ঢের বেশী জরুরি বাক্যালাপের ব্যবস্থা। ওরা একশো

বার কথা বলুক, বলতে বলতে বোঝাপড়া করুক, তার পর নির্বাচন হবে। মধ্যস্থতার দায়িত্ব গভর্ণরের। আমি রাতারাতি নির্বাচনের পক্ষপাতী নই। হাতাহাতিকে ভয় করি।

শান্তিনিকেতন, ২৮শে শ্রাবণ ১৩৬৬

বাঙালীর ক্ষুধা

('তরুণের স্বপ্ন' সম্পাদিকা শ্রীমতী মালবিকা দত্তকে লিখিত পত্র)

তোমার পত্রিকার জন্যে এবার প্রবন্ধ লিখতে পারছিনে। যা লিখছি তা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কাজেই তাকে চিঠির আকার দিচ্ছি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি স্কুলের ছাত্র। নিজে বুঝতে পারতুম না, কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিত না, কেন আমাদের বাড়ীতে ভাত কমে আসছে, কাপড় কমে আসছে, কেন ঝি চাকর ছেড়ে যাচ্ছে, কেন মা'কে তাদের মতো খাটতে হচ্ছে, কেন বাবার মন মেজাজ ভালো নয়। তিনি একদিন জেলখানা থেকে সস্তায় কিছু কাপড় কিনে নিয়ে এলেন, কয়েদীদের হাতে বোনা। আমাদের গায়ে যখন সেই কাপড়ের কোট উঠল তখন আমাদের দেখে লোকে হাসি চাপতে পারল না। অথচ তার কয়েক বছর পরে মহাত্মা গান্ধী যা পরতে বললেন তা সেই একই জিনিস। তার নাম খাদি। তখন আর হাসির কথা নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধে তখন আমি বড় হয়েছি। অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি। যুদ্ধের সময় সব কিছুর দাম বেড়ে যায়, বাড়ে না কেবল দুটি পদার্থের। একটির নাম মানুষের প্রাণ। আরেকটির নাম মানুষের টাকা। বাড়ে না বললে কম করে বলা হয়। বলা উচিত দারুণ কমে যায়। কিন্তু ইংরেজরা যুদ্ধের গোড়ার দিকে সে

বিষয়ে হুঁশিয়ার ছিল। তাই আমরা বর্মা বেদখল হওয়ার আগে তেমন টের পাইনি যে প্রাণের দাম ও টাকার দাম কমতে লেগেছে। আর-সব জিনিসের দাম বাড়তে লেগেছে।

অন্যান্য দেশ হলে সঙ্গে সঙ্গে রেশনিং শুরু হয়ে যেত। আমার এক বন্ধু যখন সেই রকম প্রস্তাব করলেন তখন তাঁর বড় কর্তা—ইনি ইংরেজ—বললেন, "লণ্ডনে যা খাটে কলকাতায় তা খাটে না। এখানে রেশনিং সম্ভব নয়।" হলো না রেশনিং। মোটের উপর একটা কণ্ট্রোল রাখা হলো। দাম যাতে সীমা অতিক্রম করে না যায়। আসলে হয়েছিল এই যে ইংরেজরা আশঙ্কা করছিল জাপানীরা বর্মার মতো বাংলা দখল করবে, তাই তাদের মনে স্থায়িত্ববোধ ছিল না। স্থায়িত্ববোধ না থাকলে দায়িত্ববোধ থাকে না। দায়িত্বহীনতার পরিণাম হলো এই যে, একদিন আবিষ্কার করা গেল কলকাতায় মাত্র দশদিনের খোরাক আছে। আর দশ দিন পরে দুর্ভিক্ষ। তখন সেই দুর্ভিক্ষকে এড়াতে গিয়ে যা ঘটল তা ইংরেজ রাজত্বের আদি যুগের ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি। সেবারেও কলকাতাকে বাঁচানোর জন্যে বাকী বাংলাদেশের ধানচাল যে কোনো দামে কিনে আনা হয়েছিল।

কণ্ট্রোল তুলে দেওয়া হলো। তুলে দেবার আগে থেকেই গ্রামে গ্রামে এজেণ্ট পাঠানো হলো। তারা যেখানে যা পায় যে কোনো দামে কেনে। এক তাড়া কাগজের টাকা ধরিয়ে দেয়। ছেলে ভোলাবার মোয়া। যে পায় সে মহা খুশি। পরে অবশ্য তা দিয়ে যা কিনতে যায় তাই দুর্মূল্য। যাদের চাল কিনে খেতে হয় তারা পড়ে গেল বিষম বেকায়দায়। যে কোনো দামে কিনতে পারে এমন সঙ্গতি কি সাধারণ গৃহস্থের আছে? আমার চাপরাশি একদিন স্পষ্ট বলে দিল, "হুজুর যদি কিছু না মনে করেন তো আমি গাড়ী লুট করব। চোখের সামনে ছেলেমেয়েদের মরতে দেখাও তো পাপ।"

আমি তাকে বোঝালুম যে, সে সরকারের লোক। সরকারের লোক হয়ে সে লুট করবে? রক্ষক হয়ে ভক্ষক হবে? আর আমি বিচারক হয়ে তাকে অপরাধ করতে দেব? আমি কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না কেমন করে সে তার আশ্রিতদের বাঁচাবে। ভিক্ষা করেও তো চাল পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় আসামী হয়ে জেলখানায় গেলে। কিংবা কাঙাল হয়ে কলকাতায় গেলে। এই শ্রেণীর লোকেরাই কলকাতার পথ ধরল। সেখানে গিয়ে "একটু ফেন দাও, মা" "দুটি ভাত দাও, মা" বলে দরজায় দরজায় মাথা কুটতে লাগল। এরা স্বভাব ভিক্ষুক নয়, স্বভাব দুর্বৃত্ত নয়, এদেরও ঘরে টাকা ছিল, কিন্তু সে টাকা চলে গেল চড়া দামে চাল কিনতে। কলকাতা এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচল। আর এরা মরল কাতারে কাতারে। আমার বন্ধু জেলা শাসক নিজের দায়িত্বে জেলার ধানচাল জেলায় আটকাতে গেলেন। সরকার থেকে চিঠি এলো, খবরদার। মুক্ত ধারাকে রোধ করতে গেছ কি মরেছ।

কমিশনারও আমার বিশেষ পরিচিত। বললুম তাঁকে, এ কী হচ্ছে? জেলা বাঁচবে কী করে? তিনি বললেন, গভর্নমেণ্ট এখন চাল নিয়ে জমা করছে। যখন যেখানে টান পড়বে তখন সেখানে ডাম্প করবে। তখন চালের দাম হু হু করে নেমে যাবে। মজুতদাররা দেখবে তারা ঠকে গেছে। ঠিক এই রকম উক্তি শোনা গেল আরেক জন বড় কর্তার মুখে। মজুতদারদের তিনি সতর্ক করে দিলেন যে তারা যদি চাল না ছাড়ে তাদের আঙুল পোড়াবে। ইংরেজের ইংরেজী ইডিয়ম বাঙালীরা বুঝবে কেন? তিনিই মুখ পোড়ালেন। এঁরা খুব যোগ্য কর্মচারী। কিন্তু অর্থনীতি এঁদের পঠিত বিষয় নয়। বিশেষত যুদ্ধকালীন অর্থনীতি। সুহ্‌রাবর্দী যে প্রদেশের খাদ্য মন্ত্রী সে প্রদেশে গুণী লোক থাকলেও তাঁকে গণছে কে? বাংলার কাণ্ডকারখানা দেখে

হতাশ হয়ে আমি চলে যাই উত্তর-পশ্চিমে। যুক্তপ্রদেশে। আলমোড়ায়। ছুটিতে। পরে শুনেছিলুম বাংলা সরকারের এজেণ্ট বিহারে গেছল চাল কিনতে। বিহারের জেলা শাসকরা একজোট হয়ে তাঁদের গভর্নরকে বলেন, সাবধান! বাইরের এজেণ্টদের এখানে ঢুকতে দেবেন না। বাংলা সরকার কত চাল চান আমাদের জানালে আমরাই সংগ্রহ করে দেব। বিহারের গভর্নর তাই করলেন। বিহারের লোক বেঁচে গেল। নইলে তারাও মরত কাতারে কাতারে। তবে তারা এমনি মরত না, মেরে মরত।

ওদিকে আলমোড়ায় গিয়ে দেখি ওরাও আমাদের মতো ভাত খায়। আর ওখানেও চালের দাম বাড়তির মুখে। তবে কি বাংলার অন্নাভাব আমাকে তাড়া করে নিয়ে চলল আলমোড়া শৈলাবাসেও? আলমোড়ায় থাকতে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেলুম কেমন করে খাদ্য-সঙ্কট পার হতে হয়। গভর্নর ছিলেন ঝানু সিভিলিয়ান, সার মরিস হ্যালেট। তাঁর মন্ত্রীদের তিনি জেলে পুরে নিষ্কণ্টক হয়েছেন। পলিটিসিয়ানরা তাঁর হাত চেপে ধরতে অপারগ। তিনি তাঁর নিজের দায়িত্বে একটি বোর্ড গঠন করলেন। নিজেই হলেন তার চেয়ারম্যান। সেক্রেটারি করে নিয়ে এলেন অধ্যাপক রুদ্রকে এলাহাবাদ থেকে মোটা মাইনে দিয়ে। রুদ্র চব্বিশ ঘণ্টা ভাবেন আর হ্যালেট সাতদিন অন্তর অন্তর বোর্ডের বৈঠকে বসে আলোচনা করেন, পলিসি নির্দেশ করেন। বোর্ডের সদস্য যাঁরা তাঁরা সবাই হাতে কলমে কাজ করেন। বাছা বাছা সিভিলিয়ানদের জেলায় জেলায় ফুড কমিশনার করে পাঠানো হয়। তাঁদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা। তিন মাসের মধ্যেই যুক্তপ্রদেশের খাদ্যের বাজার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমারও ছুটি ফুরিয়ে গেল। বাংলা-দেশে ফিরে দেখি ওখানে যা ঠাণ্ডা এখানে তা গরম। একেবারে আগুন। এখানে এক নম্বর ভুল হয়েছিল অযোগ্য গভর্নর ও অজ্ঞ

সিভিলিয়ানদের উপর নির্ভর করা। দু'নম্বর ভুল হয়েছিল মন্ত্রীদের জেলে না পোরা ও পলিটিসিয়ানদের খেলতে দেওয়া। কিছুদিন পরে লর্ড ওয়েভেল বড়লাট হয়ে কলকাতা পরিদর্শনে এলেন। প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিজের কাঁধে নিলেন। মিলিটারির লোক এসে সিভিলের কান মলে পলিসি বাতলে দিল, হুকুম জারি করতে বাধ্য করল। ব্যস্, ঠাণ্ডা! রেশনিং বছর না ঘুরতেই সম্ভব হলো।

স্বাধীনতার পরে আমি হঠাৎ সরকারের সুনজরে পড়ে জেলা শাসনের ভার পাই। সীমান্ত নিয়ে আমার মাথাব্যথা, তাই নিয়ে আমি ব্যাপৃত ছিলুম। একদিন শুনি চালের দাম চড়ছে, ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। সর্বনাশ! এমন হলো কেন! যা ভেবেছিলুম তাই। তেতাল্লিশ সালের মতো আটচল্লিশ সালেও কাউকে কিছু না বলে নির্দিষ্ট মূল্যের উর্ধ্বসীমা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তক্ষুনি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললুম। কয়েকটা অর্ডিনান্স তখনো চালু ছিল। সেগুলোকে আমি আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলুম। কী ভাগ্যি কিছু চাল ছিল আমার জেলায় সরকারী স্টকে। সেটা হলো আমার কৃপণের ধন'। তাই দিয়ে মডিফায়েড রেশনিং প্রবর্তন করা গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাজার দর নামিয়ে আনা চাই। বাজারদর নামিয়ে আনার পক্ষে মডিফায়েড রেশনিং যথেষ্ট নয়। তার জন্যে চাই সম্পূর্ণ রেশনিং। মডিফায়েড রেশনিং যেখানে চলে সেখানকার লোকের স্বাধীনতা থাকে, তারা পেট ভরাবার জন্যে খোলা বাজারে চাল কিনতে পারে। আর সম্পূর্ণ রেশনিং যেখানে চলে সেখানে তাদের পেট না ভরলে তারা অন্য কিছু খাবে, কিন্তু খোলা বাজারে চাল কিনতে পারে না, সে স্বাধীনতা তাদের নেই। চোরা বাজারে যদি কেনে তবে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

যা বলছিলুম। মডিফায়েড রেশনিং প্রবর্তন করলে সঙ্গে সঙ্গে চালের দর নামিয়ে আনতে হয়। নইলে লোকের স্বাধীনতা রয়েছে, তারা খোলা বাজারে চাল কিনে পেট ভরাবে। তারা মানে যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে তারা। তারাই পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দর বাড়িয়ে দেয়। তখন তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অক্ষম তারা হাল ছেড়ে দেয়। এবং অসন্তুষ্টের দলে নাম লেখায়। কিন্তু দর যদি নামিয়ে আনতে পারা যায় তা হলে তারা মোটের উপর সন্তুষ্ট থাকে। কী করে দর নামিয়ে আনব সে হলো আমার চব্বিশ ঘণ্টার চিন্তা। এর জন্যে আমাকে অনেক রকম উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। একটা তো কর্ডনিং। আর একটা কর্ডন ভেদ করে চাল আমার ছাড়পত্র। ছাড়পত্র আমি নিজের হাতে ইস্যু করতুম। অনেক সময় নির্দয় হতে হতো। আবিষ্কার করলুম যে দর বেড়ে যাওয়ার পিছনে কতকগুলো কারণ কাজ করছে। একটা কারণ তো সর্বসাধারণের মনে আতঙ্ক বা প্যানিক যে আর বাজারে চাল পাওয়া যাবে না, গভর্নমেণ্টও খাওয়াতে পারবে না, অতএব যে যত পারো কিনে রাখো, যে কোনো দামে কিনো রাখো। আর একটা কারণ হলো, পুলিশ জেল প্রভৃতি বড় বড় সরকারী বিভাগগুলো একসঙ্গে শত শত হাজার হাজার মণ চাল কেনে। তাদের এজেণ্টরা যেখানেই যায় সেখানেই দর বেড়ে যায়। তখন আরো দাম দিয়ে কেনে। যে কোনো দামে কেনে। টাকা তাদের কাছে কিছু নয়। ভাগ্যিস্ আমার জেলায় বড় বড় কলকারখানা ছিল না, সওদাগরি ফার্ম ছিল না। থাকলে দেখা যেত টাকা তাদের কাছেও কিছু নয়। তারাও যে কোনো দামে চাল কেনার জন্যে এজেণ্ট পাঠাত। এই সব রুই কাতলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চুনোপুটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পারবে কেন? কদ্দিন পারবে?

যেসব সরকারী বিভাগের এজেণ্ট যেখানে ইচ্ছা গিয়ে যত ইচ্ছা

টাকা ছড়িয়ে যত ইচ্ছা চাল কিনে আনত তারা আমার ইচ্ছার আমলে এলো। জেলকে আমি ধান কিনতে ও ধান ভানতে বাধ্য করলুম। তাতে কিছু আসান হলো। ব্যাপকভাবে ধান ভানাইয়েরও একটা পরিকল্পনা তৈরি করা গেল। তাতে রিলিফের কাজও হয়ে যায়। সে ক'মাস আমাকে ও আমার সহকর্মীদের ভূতের মতো খাটতে হয়েছে। মাথার চুলও অকালে পাকাতে হয়েছে। খাটুনি যত ভাবুনি তার চেয়ে অনেক বেশী। আগে অসীম চিন্তা, তার পরে অক্লান্ত কর্ম। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ভালো করে ভেবে নেওয়া আমার বহুকালের অভ্যাস। কিন্তু একবার একটা সিদ্ধান্ত নিলে আমি সেটা প্রাণপণে এন্‌ফোর্স করি।

জনসাধারণের খাদ্য—পীপলস্ ফুড—বড় সামান্য জিনিস নয়। ইতিহাস যারা পড়েছে তারা জানে ফরাসী বিপ্লবের মূলে ছিল খাদ্যের অব্যবস্থা। রুশ বিপ্লবের মূলেও তাই। সুতরাং এই সঙ্কটময় যুগে খাদ্য নিয়ে যারা ছেলেখেলা করে তারা আগুন নিয়ে খেলা করে। আমার তো এক এক সময় মনে হয় যে তেতাল্লিশ সালের সেই মন্বন্তরই ইংরেজের কাল হলো। পঁয়ত্রিশ লক্ষ নিরীহ মানুষের মৃত্যুর অভিশাপ লাগল তাদের রাজত্বের গায়ে। আগের বারের মন্বন্তরে তাদের সাফাই ছিল এই যে রাজত্বটা তাদের নয়, নবাবদের। তাই তারা নবাবকে সরিয়ে সাক্ষাৎভাবে রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছিল। এবারে তেমন কোনো সাফাই খাটত না। তেতাল্লিশ সালে তাদের রাজত্বের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। তার পরে যা টিকে রইল তা দৈহিক মেরুদণ্ড। তাদের মধ্যে হ্যালেট, ওয়েভেল প্রভৃতি কর্মযোগী ছিলেন বলেই তাদের সুনাম একেবারে মাটিতে মিশিয়ে গেল না। তারা মোটের উপর সুনাম নিয়েই বিদায় হলো। তাদের দেখে আমাদেরও কি শেখবার নেই কিছু?

খাদ্যসমস্যা আজকাল দুনিয়ার সব দেশেই কম বেশী দেখা যায়। লোকসংখ্যা বাড়ছে, এটা অবশ্য একটা কারণ। কিন্তু একমাত্র কারণ বা

প্রধান কারণ নয়। প্রধান কারণ গত মহাযুদ্ধের জের এখনো মেটে নি। শান্তি স্থাপিত হয়নি। সমস্তক্ষণ নতুন মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে। আমরা নিরপেক্ষ হলেও আমাদের অর্থনীতি অবিচ্ছিন্ন। তা ছাড়া আমরা শিল্পায়নের জন্যে মাথাভারী পরিকল্পনা করেছি। যুদ্ধকালের মতোই আমাদের কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। আসছে সেসব টাকা মুদ্রাযন্ত্র থেকে। টাকার দাম কমতে থাকলে আর-সব জিনিসের দাম বাড়তে থাকবেই। লোকের ক্রয়ক্ষমতা যদি তাল রাখতে না পারে তা হলে লোকে তিলে তিলে মরবেই। মন্বন্তরে যারা মরে তারা চটপট মরে। আর ইনফ্লেশনে যারা মরে তারা টিকিয়ে টিকিয়ে মরে। যাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত বলা হয় তারা যদি শ্রমিক শ্রেণীতে নামে তা হলে হয়তো রক্ষা পাবে, নয়তো তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাঁদের পাঁজর ভেঙে দেবে। যদি না—

যদি না অনেকগুলো অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে জোরদার নেতারা এখন থেকে তৈরি হন। একটা তো হ্যালেট, রুদ্র প্রভৃতির মতো লোকদের খুঁজে বার করা ও তাঁদের পদ্ধতি কাজে লাগানো। আর একটা হলো পাইকারী খাদ্য সরবরাহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা। সমবায় খামারও উচিত সিদ্ধান্ত। চতুর্থ সিদ্ধান্ত হবে ভাত কম খেয়ে রুটি বেশী খাওয়া ও খাওয়ানো।

শান্তিনিকেতন, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

অপক্ষপাত

আমার ইতিহাসের অধ্যাপক একদিন আমাকে বলেন, "অশোকের সাম্রাজ্য স্থায়ী হলো না কেন, জানো? তিনি তাঁর নিজের ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম করতে গিয়ে অন্য ধর্মের অবলম্বীদের সহানুভূতি হারান। রাষ্ট্র থাকবে সব ধর্মমতের ঊর্ধ্বে। তা হলেই সকলের সহানুভূতি পাবে।"

তখনকার দিনে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের দিনে এসব কথা আমার ভালো লাগেনি। আমি তখন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতুম যে অশোকের যুগকে ফিরিয়ে আনা যায়, যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করা যায়, বৌদ্ধধর্মের সার সত্য যে অহিংসা তাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি করা যায়। আমার অধ্যাপক যদিও নিরীহ সাত্ত্বিক বৈষ্ণব তবু আমি তাঁর উক্তির এই কদর্থ করলুম যে তিনি হিংসাবাদী হিন্দু, তিনি বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী, তাই ভারতের গৌরব যে অশোক সেই অশোকের ছিদ্রান্বেষী। অথচ এই অধ্যাপকই আমাকে পঞ্চাশের থেকে আটচল্লিশ নম্বর দিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন।

তারপর অনেক কাল কেটে গেছে। অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আমার মতবাদ যে ষোলো আনা বদলে গেছে তা নয়। কিন্তু একটা কথা আবার মনে গেঁথে গেছে। রাজা যদি নিজের ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম করতে যান তবে অন্য ধর্মের অবলম্বীদের সহানুভূতি হারান। রাষ্ট্র থাকবে সব ধর্মমতের ঊর্ধ্বে। তা হলেই সকলের সহানুভূতি পাবে। স্থায়ী হবে।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নেতারা যখন স্থির করেন যে

ভারতের নীতি হবে সেকুলার স্টেট স্থাপন, তখন বহু লোক তাঁদের বিপক্ষে দাঁড়ান। এঁদের উদ্দেশ্য হলো ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপন। এঁরা হিন্দু। সুতরাং এঁদের ধর্মই হবে ভারতরাষ্ট্রের ধর্ম। তা যখন হলো না তখন এঁরা বলতে আরম্ভ করলেন এটা ধর্মহীন রাষ্ট্র। যেন সেকুলায় কথাটার মানে ধর্মহীন।

ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপনের চেষ্টা ইতিহাসে বার বার হয়েছে। যে দেশে রাজা ও প্রজা উভয়েরই ধর্ম এক সে দেশেও দেখা গেছে যে পাদ্রীদের উৎপাত রাজাদের সহ্য হয়নি, মোল্লাদের উপদ্রব সুলতানদের সহ্য হয়নি। জাপানের সম্রাট তো নারা থেকে রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে কিয়োতে চলে যান বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তক্ষেপ এড়াতে। ধর্ম নিশ্চয় রাজা প্রজা উভয়েরই প্রিয় বস্তু। কিন্তু রাষ্ট্রের থেকে তাকে পৃথক করে না রাখলে কতক লোক তার অন্যায় সুযোগ নেয় ও আর সব লোক তাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে রাষ্ট্রকেই অভিশাপ দেয়।

যে দেশে একাধিক ধর্মমত প্রচলিত সে দেশে তো রাষ্ট্রের কর্তব্য আরো পরিষ্কার। রাষ্ট্র যদি কোনো একটি সম্প্রদায়ের পক্ষ নেয় তা হলে অপরাপর সম্প্রদায় নিরাপদ বোধ করে না। রাষ্ট্রই পরিণামে দুর্বল হয়। বাবর পুত্র হুমায়ুনকে হিতোপদেশ দিয়ে যান হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী হতে। মুঘল সাম্রাজ্য সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আকাশে মাথা তোলে। আওরংজেব তাঁর নিজের ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম করতে গিয়ে সেই ভিত্তিটাকেই ভেঙে দিয়ে গেলেন।

ইন্দোনেশিয়ার মোল্লারা ও সিংহলের ভিক্ষুরা এখনো এ তত্ত্ব বোঝেনি। তাই সে সব দেশ স্বাধীনতার পরে আরো দুর্দশায় পড়েছে। বর্মাতেও ভিক্ষুদের নিয়ে বিপদ মনে হয় বাধবে। সেকুলার স্টেট যদিও অনেক দিন হলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবু ভিক্ষুরা সেটা মেনে নেয়নি। তাদের সাহায্য নিয়ে এবার যাঁরা নির্বাচনে জিতেছেন তাঁরা সেই সাহায্যের দাম দিতে গেলেও পশতাবেন, না দিলেও পশতাবেন।

পাকিস্তান ইসলামী স্টেট গড়তে গিয়ে মিলিটারি ডিকটেটরশিপ গড়েছে। রাষ্ট্র যদি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ না হয় তা হলে পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার করা অতি বড় সেনা-নায়কেরও দুঃসাধ্য হবে। সম্প্রতি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আস্থালাভ করে ডিকটেটর আখ্যা থেকে মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু সামরিক আইন রদ হয়েছে বলে শুনিনি। আশা করা যাক যে পাকিস্তান ক্রমে গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসবে আমাদের কারো কথায় নয়, নিজেদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে পাকিস্তানীরা হৃদয়ঙ্গম করবে একদিন যে সব সম্প্রদায়ের প্রজার সহানুভূতি ভিন্ন রাজার বা রাজ্যের স্থায়ী কল্যাণ নেই।

তা বলে আমি এমন কথাও বলব না যে, ভারত বা পাকিস্তান বা সিংহল বা বর্মার কর্তাব্যক্তিরা হবেন ধর্মহীন বা নীতিহীন বা বিবেক-হীন। তাঁরা যে যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস রেখে নিজ নিজ নীতিবোধ অনুসারে বিবেকসম্মতভাবে কর্তব্য কর্ম করে যান। হাজার পার্থক্য সত্ত্বেও সব ধর্মের এক জায়গায় একটা মিল আছে। সেটা তাদের ধর্মত্ব। আমরা খ্রীস্টান না হলেও বুঝি যে অমুক একজন ধার্মিক ব্যক্তি, অমুক সাহেব তা নন। ধার্মিক মুসলমানদের আমার বাবা অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাঁরাও করতেন তাঁকে সম্মান। রাজনীতির উপর থেকে সত্যিকার ধার্মিক হিন্দু বা ধার্মিক মুসলমানের প্রভাব তিরোহিত হলে আঁধার নেমে আসবে।

আমার মনে হয় অশোক এই অর্থেই ধার্মিক ছিলেন। সাম্প্রদায়িক অর্থে নয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদেরও তিনি আদর করতেন তার প্রমাণ আছে। ধর্মকে তিনি রাজনীতির কাজে লাগাননি। সিঁড়ির মতো ব্যবহার করেননি। ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্যে বা ক্ষমতা ভোগ করার জন্যে তিনি বৌদ্ধধর্মের সাহায্য নেননি। ইতিহাসে তাঁর অস্ত্রবল-

ত্যাগের ও মানবপ্রেমের তুলনা নেই। তাঁর সাম্রাজ্য যদি স্থায়ী হয়ে না থাকে তবে তার অন্য কারণ আছে। তাঁর আদর্শ তো মানবজাতির অন্তরে স্থায়ী হয়েছে।

কিন্তু থাকতেও পারে আমার ইতিহাসের অধ্যাপক মহাশয়ের সেই উক্তিতে কিছু সত্য। না থাকলে অশোকের নামটাও এ দেশের ঐতিহ্য থেকে মুছে যেত কী করে? ঢাকা থাকত কেন শুধু বৌদ্ধদের গ্রন্থে আর পাহাড়ে পর্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে যার সন্ধান দিল বিদেশী আগন্তুকরা দু'হাজার বছর পরে?

(১৯৬০)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় একবার "প্রবাসী"তে একটি গল্প পড়েছিলুম। পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা। নাম ঠিক মনে নেই। বোধ হয় "অর্থমনর্থম্"? গল্পটি আমার বড় ভালো লেগেছিল। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সেই প্রথম চোখে পড়ে। তখন আমি জানতুম না কে তিনি ও কোথায় থাকেন। পরবর্তী বয়সে যখন পাটনা কলেজে পড়ি তখন ভাগলপুরের সহপাঠী কৃপানাথ মিশ্র আমাকে উপেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতাদের পরিচয় শোনায়।

একদিন কৃপানাথের কাছেই শুনি উপেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে "বিচিত্রা" নামে একটি বিরাট ও বিচিত্র মাসিকপত্র সম্পাদনা করতে যাচ্ছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার জন্যে লিখছেন। কৃপানাথের পরামর্শে আমি আমার একটি রচনা "বিচিত্রা" সম্পাদকের দরবারে পাঠাই। যতদূর মনে পড়ে কৃপানাথেরই মারফত। উপেনবাবু বোধ হয় তখনো

ভাগলপুর থেকে বিদায় নেননি। আমার প্রবন্ধটি সাদরে গ্রহণ করেন ও পরের মাসেই প্রকাশ করেন। আমার দেওয়া নাম বদলে দিয়ে নামকরণ করেন "রক্তকরবীর তিনজন।"

তার পর আমার বন্ধু কৃপানাথ আমাকে চিঠি লেখে, সম্পাদক বলেছেন আরো রচনা পাঠাতে। আমি তার উত্তরে লিখি, আমি তো বিলেত যাচ্ছি। বিলেত সম্বন্ধে আমার ইম্‌প্রেসন লিখতে পারি। কৃপানাথ আমাকে জানায় যে আমার প্রস্তাব মঞ্জুর।

সম্পাদকের সঙ্গে তখনো আমার সাক্ষাৎকার বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটেনি। ঘটতে পারত যদি কলকাতা হয়ে বোম্বে যেতুম। কিন্তু সেবার হঠাৎ বন্যায় রেলপথ ভেঙে যায়। কটক থেকে কলকাতা যেতে হলে বেজওয়াডা হায়দরাবাদ মানমাদ ঘুরে যেতে হয়। আমার তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কটক থেকে যেদিন মাদ্রাজ মেলে উঠতে যাব সেদিন আমার কটক কলেজের বন্ধু প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় এসে বলেন যে তাঁর বৌদিদি নির্মলা দেবীও সেই ট্রেনে যাচ্ছেন, তিনি যাবেন কলকাতা, আমি যেন একটু দেখি শুনি।

কে কাকে দেখে শোনে! আমি নির্মলাদিকে না নির্মলাদি আমাকে! অসুস্থ শরীর নিয়ে দীর্ঘ রেলপথে বোম্বে ও দীর্ঘতর জলপথে বিলেত যাচ্ছি। ঘোল ভিন্ন আর কোনো পথ্য নেই। তারই এক বোতল আমার সঙ্গে। যাত্রা শুরু হলো মাঝরাত্রে। দেখলুম নির্মলাদিও খুব উদ্বিগ্ন। কলকাতার আত্মীয়দের জন্যে। পথে আমরা কথা যদি কয়ে থাকি তো সাহিত্য সম্বন্ধে নয়। কেই বা জানত যে আমি একজন সাহিত্যিক! "বিচিত্রা" সম্বন্ধেও নয়। কেমন করে জানব যে নির্মলাদি হলেন উপেন্দ্রনাথের আত্মীয়া!

বোম্বের যাত্রী আমি, কলকাতার যাত্রী তিনি, মানমাদে আমরা বিভিন্ন ট্রেন ধরি। তার পর বোম্বেতে বসে প্রথম কিস্তি লিখি আমার

"পথে প্রবাসে"র। জাহাজে ওঠার আগেই ডাকে দিই। এমনি করে "বিচিত্রা"র সঙ্গে দু'বছরের ধারাবাহিক সম্পর্ক আরম্ভ হয়।

দু'বছর পরে যখন দেশে ফিরি উপেনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। তখন তিনি কলকাতায়। তাঁর বাড়ীতেই আবার দিদির সঙ্গে দেখা। এইসব আকস্মিক যোগাযোগের দরুন উপেনবাবুর মনে ছাপ থেকে যায় যে তাঁর পত্রিকায় "পথে প্রবাসে" প্রকাশিত হওয়ার মূলে ছিলেন নির্মলা দেবী। সেটা ঠিক নয়। মূলে ছিল কৃপানাথ। সেও তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র। তা হলেও বলা যেতে পারে যে আমার প্রতি উপেনবাবুর যে অপরিসীম স্নেহ পরবর্তী কালে অনুভব করেছি তা কেবল সাহিত্যিক কারণে নয়। অলক্ষ্যে অন্য কারণও ছিল। "পথে প্রবাসে"র না হোক, পথের ও প্রবাসের গোড়ায় তো দিদি।

"পথে প্রবাসে" যখন শেষ হয়ে গেল উপেন্দ্রনাথ বললেন আমাকে উপন্যাস লিখতে। উপন্যাস লিখব আমি! কখনো তো লিখিনি। পারব কি লিখতে? তিনি আমাকে অভয় তো দিলেনই, এমন কথা বললেন যা একটি নতুন লেখকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। তার পর আমাকে একখানি চিঠি লিখে উপন্যাস লেখার কৌশলও শিখিয়ে দিলেন। বলতে গেলে তাঁরই কাছে আমার উপন্যাস রচনার হাতে-খড়ি। "সত্যাসত্য" তাঁরই আগ্রহে "বিচিত্রা"য় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে মাঝ পথে থেমে যায় আমারই দোষে। আমিই নিয়মিত কপি যোগাতে পারিনে। সরকারী কাজের চাপে অস্থির। সেই একই কারণে "বিচিত্রা"র সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ হতে হতে ছিন্ন হয়ে যায়। কিছুদিন পরে "বিচিত্রা"ও বন্ধ হয়ে যায়।

আগে ও পরে কত বার দেখা হয়েছে। নিজের জীবনের কথা বলেছেন। নিকট আত্মীয়ের মতো। উৎসাহের কোনো দিন কমতি দেখিনি। সঙ্গতি থাকলে আবার "বিচিত্রা" বার করতেন। আমাকেও

টেনে নামাতেন। "গল্পভারতী"র সম্পাদনভার পেয়ে লিখেছিলেন "বিচিত্রা"র দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে চান। আমরাও যেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে "বিচিত্রা"র দিনগুলিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। আমিও তাঁর মতো আপনার সম্পাদক আর পাইনি। আমি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি এর মূলে "বিচিত্রা" ও তার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ। আমার কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা ছিল। পূরণ করতে পারিনি। সম্পাদক হিসাবে রামানন্দবাবুর পরেই তাঁর স্থান। লেখক তৈরি করে নেওয়ার রহস্য তিনি জানতেন। নইলে আমাকে দিয়ে উপন্যাস লেখানোর খেয়াল আর কার মাথায় আসত!

তাঁর স্নেহের ঋণ কি শোধ করতে পারব কোনো দিন!

(১৯৬০)

রাজশেখর বসু

রাজশেখরবাবুর জন্মদিন মার্চ মাসে। ততদিন তিনি থাকবেন কি না সন্দেহ করে তাঁর অনুরক্ত সাহিত্যিকরা তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আসেন জানুয়ারি মাসে। আমি সেদিন ঘটনাচক্রে কলকাতায় পৌঁছই। এই উপলক্ষে নয়, অন্য উপলক্ষে। পৌঁছেই শুনতে পেলুম রাজশেখরবাবুর সম্বর্ধনা। মন বলল এই বোধ হয় শেষ সুযোগ। গিয়ে যোগ দিলুম।

বললুম, "আমরা অন্তরের সঙ্গে কামনা করি আপনি আরো অনেক দিন বাঁচুন।"

তিনি তখন আসন ছেড়ে ভিতরে যাচ্ছিলেন। বললেন, "আর না। এইবার চটপট চলে যেতে চাই।"

বুঝতে পারলুম তাঁর বাঁচবার ইচ্ছাটাই চলে গেছে। তাঁকে ধরে রাখতে পারা যাবে না। জন্মদিন দেখে যেতে পারবেন কি না সত্যি সন্দেহ। উপরে গিয়ে যতক্ষণ পারি তাঁর সঙ্গে কাটালুম। কয়েকটি ঘরোয়া প্রশ্ন করলেন। উত্তর দিলুম।

সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নববর্ষের সাহিত্য আসরে প্রত্যেক বছর রাজশেখরবাবু যান। আমিও যাই। এবার আমি তাঁকে প্রত্যাশা করিনি বলে তাঁকে কাছে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলুম। আমার কুশলপ্রশ্নের উত্তরে বললেন, "এখন আমি ভালোই আছি।" মনে হলো এ যাত্রা বিপদ কেটে গেছে। তাঁকে আরো অনেকদিন আমাদের মধ্যে পাব। কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবেই হলো। সভার মাঝখানে তিনি উঠলেন। আর বসে থাকতে পারছিলেন না। তাঁকে দাঁড়াতে সাহায্য করলুম। সভার বাইরে নিয়ে গেলুম। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে ধরল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সই করলেন একরাশ অটোগ্রাফের খাতা। আমার কনিষ্ঠা কন্যারও। সেই শেষ দেখা। আমার শেষ স্মৃতি তিনি সভার বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে অটোগ্রাফের খাতা সই করছেন। চমৎকার হাতের লেখা। হাত একটুও কাঁপছে না। জরা কিংবা ব্যাধির চিহ্নই নেই। এটা এক শনিবার সন্ধ্যায়।

তাঁর মৃত্যুর খবর এলো শান্তিনিকেতনে বৃহস্পতিবার সকালে। অভাবনীয় ঘটনা। মনটা সারাদিন বিমর্ষ হয়ে রইল। রাজশেখরবাবু যেতেই চেয়েছিলেন, যে ভাবে গেলেন তা' চেয়ে ভালোভাবে কে কবে গেছেন! এ মৃত্যু সাধুসজ্জনের মৃত্যু। কর্মনিষ্ঠ পুরুষের মৃত্যু। এর জন্যে সাধনা করতে হয়। প্রস্তুত হতে হয়। রাজশেখরবাবু একে বহু

তপস্যায় অর্জন করেছেন। জীবনের শেষে এটি একটি পূর্ণচ্ছেদ। তাঁর সেই সুন্দর হস্তাক্ষরে "ইতি" লিখে দাঁড়ি টেনে সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে তিনি তাঁর জীবনলিপি সমাপ্ত করলেন।

(১৯৬০)

আধুনিক জাপানী সাহিত্য

গত শতাব্দীর শেষভাগে জাপান হাউইয়ের মতো উঠল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে হাউইয়ের মতো পড়ল। উত্থান ও পতনের মাঝখানে মাত্র সাতাত্তর বছরের ব্যবধান। এমন উত্থানও কেউ কোনোকালে দেখেনি। এমন পতনও ইতিহাসে লেখে না।

জাপানের মনীষীরা কি জানতেন না যে এ রকম হতে পারে? জানতেন। নয়া জমানা শুরু হয় ১৮৬৮ সালে সম্রাট মেইজি যখন সেনাপতিবংশের হাত থেকে স্বহস্তে শাসনভার নিয়ে এদো শহরে এসে বসেন, এদোর নাম দেন তোকিয়ো। তার আগে মিলিটারি কর্তাদের নিরঙ্কুশ শাসনে মনীষীদের মুখ বন্ধ ছিল। মনীষীরা সাধারণত চীনা ভাষায় লিখতেন। জাপানীভাষায় বড় জোর একত্রিশ কিংবা সতেরো সিলেবলের কবিতা বানাতেন। ওটা ছিল রাজাপ্রজা সর্বসাধারণের ব্যসন। জাপানী সাহিত্যের ভার পড়েছিল যাঁদের উপরে তাঁরা জনপ্রিয় লেখক। লিখতেন জনপ্রিয় নাটক ও নভেল। পাশ্চাত্ত্য দেশ বা সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। আধুনিক যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁদের শিক্ষাগুরু চীনারাও তাই। চীনদেশের কন্‌ফিউসিয়ান মনুসংহিতা অনুসারে জাপান শাসিত হতো। বর্ণাশ্রমী সমাজ। স্ত্রীশূদ্রের অধীনতার

উপর স্বাধীনতার ভিত্তি। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। তাসের দেশ। বিদেশের বাতাস লাগলে তাসের কেল্লা ধ্বসে পড়বে।

আসলে মেইজিকে যারা ক্ষমতা নিতে আহ্বান করেছিল তারা আশা করেছিল যে, মার্কিনদেরকে বন্দরে ঢুকতে দেওয়া রদ হবে। বিদেশীদের প্রভাব যেটুকু পড়েছে সেটুকুও মুছে ফেলা হবে। শোগুনরা যে ভুল করেছে সেটার সংশোধন হবে। মেইজি করলেন তার বিপরীত। সমুদ্রপারের লোকদের যেমন জাপানে আসতে দিলেন, সমুদ্রপারের দেশে তেমনি জাপানীদের যেতে দিলেন। শিক্ষাগুরু এতদিন ছিল চীনারা। এখন থেকে হলো পশ্চিমীরা। দেখতে দেখতে জাপান আধুনিক জ্ঞানে জ্ঞানবান ও বলে বলীয়ান হয়ে উঠল। কিন্তু বিপদ বাধল তার নিজের ঘরে। যে দেশ আধুনিক হবে সে দেশ কি ফিউডাল থাকতে পারে? বর্ণাশ্রম বজায় রাখতে পারে? স্ত্রীশূদ্রকে পায়ে দলতে পারে? কন্‌ফিউসিয়ান মনুসংহিতার দ্বারা শাসিত হতে পারে? মেইজি পড়ে গেলেন দুই শক্তির মাঝখানে। এক শক্তি বলে, এগোও। আরেক শক্তি বলে, পেছোও। একদল বলে, আধুনিকতা যদি হলো গণতন্ত্র কেন হবে না? উদারতন্ত্র কেন হবে না? আরেক দল বলে, জাপান তার আত্মাকে হারাতে বসেছে। ফিরে চল অতীতে। ফিরে চল খোলসের মধ্যে। মেইজি করেন কী? দেশকে দিলেন জার্মান মডেলের শাসনতন্ত্র। সৈন্যদলও হলো জার্মান ছাঁচে ঢালাই। আপনি হলেন দোসরা জার্মান কাইজার। এক এক করে পররাজ্য গ্রাস করা আরম্ভ হলো। তাতে উপস্থিত সমস্যা মিটল। রক্ষণশীল সমাজের গায়ে আঁচ লাগল না। অথচ প্রগতির মুখোস পরা হলো। দেশ অগ্রসর হলো বইকি। কিন্তু সামনের দিকে নয়। বাইরের দিকে। জনগণের দিকে নয়। উপনিবেশের দিকে। গভীরতার দিকে নয়। উচ্চতার দিকে। গ্রেট পাওয়ার হওয়ার দিকে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ওকাকুরা যখন ভারতে আসেন তখন জাপানের চিরন্তন আদর্শের কথা বলেন। সে আদর্শ কেবল জাপানের নয় প্রাচ্যের আদর্শ। জাপানের সত্যিকার যে আত্মা হাজার বছর আগে নারা ও হেইআন যুগের সভ্যতায় ব্যক্ত হয়েছিল সে কি আবার ব্যক্ত হবে না? হবে, হবে। যেমন হবে আমাদের মৌর্য যুগের গুপ্তযুগের সভ্যতার অন্তরাত্মা। ওকাকুরা ছিলেন বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার সমভাবের ভাবুক। আমরা তাঁকে কাউন্ট ওকাকুরা বলে ভুল করে থাকি। তিনি কাউণ্ট ছিলেন না। তার পুরো নাম ওকাকুরা কাকুজো। জাপানীদের বংশনাম আগে, স্বনাম পরে। সাহিত্যিক নাম ওকাকুরা তেনসিন। এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। জাপানের শিল্পীমহলে একদা তাঁর প্রভূত প্রভাব ছিল। দ্বিতীয়বার যখন ভারতে আসেন রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ পূর্তি হয়েছে। তাঁরও বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এ দেশ থেকে আমেরিকা হয়ে জাপানে ফিরে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। যে বছর রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান।

ওকাকুরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রিয়ম্বদা দেবীকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন সেসব কিছুকাল আগে "বিশ্বভারতী কোয়াটারলি"তে প্রকাশিত হয়েছে। তার সুরে অন্তহীন হতাশা। স্বদেশের উপর তাঁর বিশ্বাস টলেছিল। চিঠিগুলি পড়ার সময় আমি ভেবেছিলুম এটা শুধু সেই একজন আদর্শবাদীর জীবনে ঘটেছে। তা নয়। জাপানী সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে দেখছি ১৯১২ সালে যখন মেইজির মৃত্যু হয় তখন জাপানের বড় বড় চিন্তানায়কদের সকলের মনেই নৈরাশ্য। চুয়াল্লিশ বছরের রাজত্বের উদয়কাল যেমন গোলাপী অন্তকাল তেমনি গেরুয়া। ক্ষমতা রয়ে গেছে শোগুনশাসিত জাপানের মেরুদণ্ড মিলিটারিস্টদের হাতে। তাদের হাতের আড়ালে আরো একজোড়া হাত। সে হাত

ক্যাপিটালিস্টদের। নয়া জমানায ওরাই ঈশ্বর। এদিকে শহর ফুলে ঢোল হযেছে। যত্র তত্র কলকারখানা, যত্র তত্র বেশ্যালয, যত্র তত্র যক্ষ্মারোগ আর অবক্ষয। ইতিমধ্যে কতক লোক সোশিযালিস্ট বা অ্যানারকিস্ট হযেছে। কতক খ্রীস্টীয শান্তিবাদী। রুশ-জাপানী যুদ্ধের সময় এরাই প্রতিবাদ করেছিল। চিন্তানায়করা মৌন। বিদেশী শাসনে আমাদের চিন্তানাযকরা যেমন মুখর ছিলেন স্বদেশী শাসনে জাপানের চিন্তানাযকরা তেমন মুখর হতে সাহস পাননি। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য তাঁদের কণ্ঠরোধ করেছিল। মিলিটারিস্ট ও ক্যাপিটালিস্টরা সম্রাটকে সামনে রেখে তাঁর প্রতি লোকের আনুগত্যের সুযোগ নিযেছিল। এদিক থেকে আমরা অনেক বেশী সাহসী ছিলুম।

মেইজি রাজা হযে যখন অচলাযতনের সব ক'টা দোর জানালা খুলে দেন তখন জাপানীরা প্রথম মুক্তির প্রেরণায সমগ্র বিশ্বের সমস্ত আধুনিক যুগটাকেই এক গণ্ডুষে পান করে। বঙ্কিমের সমবযসী ফুকুজাওযা যুকিচি হলেন তাদের রামমোহন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে "বিদ্যায উৎসাহ" নামক গ্রন্থের পাঁচ বছরে সতেরোটি সংস্করণ হয। গ্রন্থের আদিতেই ছিল এই ক'টি লাইন: "বিধাতা একজন মানুষকে আরেক-জন মানুষের উপরে বা নিচে রেখে সৃষ্টি করেন নি।" তিনি বলেন, ফিউডাল ব্যবস্থা ভেঙে দিযে নতুন সমাজ গড়তে হবে। সব নাগরিকের হবে সমান অধিকার। কনফিউসিযাসের নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত উচ্চাবচ সমাজকে তিনি এক কথায় খারিজ করেন। প্রাচ্যদেশের আধ্যাত্মিকতাকেও তিনি শতহস্ত দূরে সরিযে দেন। তার চেয়ে স্পৃহনীয় প্রতীচ্যের আধিভৌতিক সভ্যতা। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশ হবে সকলের সঙ্গে মিলে। শিক্ষার দরুন হবে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি। জীবন হবে আরো সমৃদ্ধ। এর পরে ফুকুজাওয়া লেখেন সভ্যতা সম্বন্ধে এক সন্দর্ভ। তাতে জাপানী সভ্যতার পথনির্দেশ

করেন। খণ্ডন করেন চীনাভাষায় পণ্ডিত রক্ষণশীল উচ্চশ্রেণীভুক্ত বর্ণাশ্রমীদের আপত্তি। রামমোহন রায় বনাম রাধাকান্ত দেব।

আমাদের দেশে সংস্কৃত যেমন ছিল রক্ষণশীলদের হাতের হাতিয়ার জাপানে চীনভাষাও তেমনি। দীর্ঘকাল থেকে পাশাপাশি দুটি ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। উচ্চ বর্ণের জন্যে চীনভাষা। নিম্নবর্ণের জন্যে জাপানী ভাষা, তাও চীনলিপিতে লিখিত। মেইজি আমলে যেসব স্কুল স্থাপন করা হয়, তাতেও একজন করে কন্‌ফিউসিয়ান নীতি-শিক্ষক থাকতেন। ধীরে ধীরে জাপানীরা চীনভাষা ও কনফিউসিয়ান নীতির আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়। জাপানী ভাষার লেখকদের ঝোঁক ছিল আমাদের লেখকদেরই মতো সাধুভাষার উপর। সাধুর জায়গায় চলতি ভাষা চালাতে চেষ্টা করলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ফুতাবাতেই। ১৮৮৮ সালে লেখা 'ভাসতে থাকা মেঘ' বলে এঁর উপন্যাস চলতি ভাষার তথা আধুনিক পদ্ধতির প্রথম উপন্যাস। লেখকের বয়স তখন তেইশ বছর। রুশ ভাষা শিখে টুর্গেনিভের 'বাপেরা আর বেটারা' পড়েছেন। আমাদের সঙ্গে জাপানীদের এইখানে মস্ত এক তফাত। ইউরোপ আমাদের কাছে আসে ইংরেজীর মাধ্যমে ও বিলম্বে। জাপানীদের কাছে যায় ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ও রাশিয়ান চার চারটে ভাষার মারফত ও চটপট। সব সময় নয় কিন্তু। ওখানেও অধিকাংশ স্থলে অনুবাদ করা হতো ইংরেজী কিংবা ফরাসী অনুবাদ থেকে। মোটের উপর ফরাসীর উপরেই ওদের সাহিত্যিকদের পক্ষপাত। বৈজ্ঞানিকদের পক্ষপাত জার্মানের উপরে। রাজনীতিকদের ইংরেজীর উপরে। বামমার্গীদের রাশিয়ানদের উপরে। হাঁ, সেই মেইজি আমলের গোড়া থেকেই নাইহিলিস্টদের সম্বন্ধে আগ্রহ।

নয়া জমানায় সব নাগরিক সমান হলো না যদিও, তবু সবাইকেই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হলো। দেখতে দেখতে বিরাট এক পাঠকশ্রেণী

তৈরি হলো। এদের জন্যে রাশি রাশি সস্তা খবরের কাগজ ছাপা হলো। খবরের কাগজের পাতায় কেবল যে ছুনিয়ার খবর থাকল তাই নয়, ছুনিয়ার গল্প উপন্যাস তর্জমা করে পরিবেশন করা হলো। অনুবাদে আর কাঁহাতক তৃপ্তি হয়! মূল উপন্যাস দিনের পর দিন ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হলো। এখনো হয়। ধরুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তারাশঙ্করের "হাসুলি বাঁকের উপকথা" কি "যুগান্তরে" বুদ্ধদেবের "তিথিডোর"। এখানে বলে রাখতে হয় যে জাপানী পাঠকের গল্প উপন্যাস ক্ষুধা মেইজি আমলের পূর্বেও ছিল। তখনকার দিনের কথাসাহিত্যকে বলা হতো গেসাকু সাহিত্য। একালের মতো মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। তবু ছিল একটা জাপানী পদ্ধতির ছাপা। তাই জাপানী বই বটতলার বইয়ের মতো যথেষ্ট বিক্রি হতো। সেই সূত্রে পেশাদার এক লেখকগোষ্ঠীও ছিল। নয়া জমানায় এঁরাও কিছুকাল টিকে ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষতক এঁদের মোমবাতি টিম টিম করে জ্বলছিল। কিন্তু আধুনিক লেখকদের বিজলীর বাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এঁরা পারবেন কেন? কালের হাওয়া এদের নিবিয়ে দিল।

আধুনিক সাহিত্য যেমন এ দেশে তেমনি ও দেশে ইউরোপীয় সাহিত্যের ছাঁদে গড়া। বিষয়টা যদিও স্বদেশী। পাঠকদের রুচি বদলাবার আগেই লেখকদের রুচি বদলে যায়। নতুন লেখকরা আর পুরোনো ধরনের বই লিখতে চান না। বঙ্কিম লিখবেন না "চাহার দরবেশ"। রবীন্দ্রনাথ "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা"। কিন্তু কিছু-দিন পরে লেখকদের মধ্যেই মতদ্বৈধ দেখা দিল। একদল বললেন গেসাকু না হয় নিচু দরের, কিন্তু গেন্‌রাকু যুগের কীর্তিমানদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করা কি ভালো? আমরা কি পূর্বপুরুষহীন ভুঁইফোঁড়? আমাদের ঐতিহ্য কি কারো চেয়ে কম? গেন্‌রাকু যুগ হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এদেশের তুলনায় জাপানের সাহিত্য সে সময়

অনেক উন্নত ছিল। চিকামাৎসু লিখছিলেন নাটক। নাট্যশালা ছিল পশ্চিমসম্পর্কশূন্য অথচ পশ্চিমের মতো সাড়ম্বর। সাইকাকু লিখছিলেন উপন্যাস। আর বাশো রচনা করছিলেন হাইকু কবিতা। সে এক যুগ বটে। আরো আগে একাদশ শতাব্দীতে সম্রাজ্ঞীর সহচরী মুরাসাকি শিকিবু লিখেছিলেন "গেন্‌জি কাহিনী"। গেন্‌জি নামক রাজকুমারের কৃষ্ণলীলা। কেবল জাপানের কেন, সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাচীন উপন্যাস। এখন পর্যন্ত কোনো দেশের কোনো মহিলা ওর চেয়ে রসোত্তীর্ণ কালজয়ী উপন্যাস লেখেননি। পুরুষরাও খুব কম পেরেছেন।

ক্লাসিকালের প্রতি ঝোঁক বেশী দিন টিকল না। গেসাকুর মতো গেনরাকুও যুগের সঙ্গে বেখাপ। জাপানী সাহিত্যিকরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ গোধুলিকাল শেষ করে দিলেন।

বিংশ শতাব্দীর লেখকদের পরিচয় জানতে চাইলে খোঁজ নিতে হয়, ইনি কি ন্যাচারালিস্ট না রোমান্টিসিস্ট না রিয়ালিস্ট না আইডিয়ালিস্ট না সুররিয়ালিস্ট না ফিউচারিস্ট না existentialist? অনেক সময় আবার "নিও" উপসর্গ যোগ করতে হয়। আমাদের কাছে হাস্যকর ব্যাপার। কোন্ লেখক আগে কোন্ ইষ্ট মন্ত্র জপ করতেন, তার পরে কোন্ ইষ্ট দেবতাকে ভজলেন, এখন তাঁর ইষ্ট কী, এসব বিদগ্ধ জাপানীদের নখদর্পণে।

সাধারণত বিংশ শতাব্দীর জাপানী সাহিত্যকে এইভাবে সাজানো হয়। প্রথম ঝাঁকের লেখকরা ন্যাচারালিস্ট। তাঁদের মনের মানুষ জোলা, ফ্লোবেয়ার, মোপাসাঁ। তাঁদের নিজেদের মধ্যে অগ্রগণ্য শিমাজাকি তোসন, কুনিকিদা দোপ্‌পো, তায়ামা কাতাই। নাগাই কাফু আগে এই ঝাঁকে ছিলেন। বছর কয়েক পরে এঁদের বিরুদ্ধে একটা "গেল" "গেল" রব ওঠে। বিরুদ্ধবাদীরা কিন্তু বিভিন্ন ঝাঁকের পাখী। একটা ঝাঁক আইডিয়ালিস্ট বা রোমান্টিসিস্ট বা একাধারে

দুই। এঁদের গুরু নীটশে, অযকেন, টেগোর, বের্গস, মেটারলিঙ্ক। হাঁ, রবীন্দ্রনাথও অন্যতম। সুতরাং এঁরা ঠিক পশ্চিমের কথায় ওঠেন বসেন না। এঁদের যিনি নেতা তিনিই একদিন হন জাপানের শ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখক নাৎসুমে সোসেকি। এই ঝাঁকেরই একটি শাখার নাম শিরাকাবা। তার মানে সাদা বার্চ। বেত। ওই নামের পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন অভিজাত বংশের মুশাকোজি সানেআৎসু! চাষী ও ছোটলোকদের জন্যেই এঁর দরদ। টলস্টয়পন্থী না হলেও টলস্টয়সদৃশ। এঁর সঙ্গে এঁর বন্ধু শিগা নাওইয়া। দীনহীন পতিত-জনের বন্ধু। শিগা একবার নিরুদ্দেশ হয়ে যান জীবনের অতলান্ত দেখতে। সাহিত্য করতে তাঁর শখ ছিল না। তিনি জীবনদার্শনিক। মুশকোজি তাঁকে সাহিত্যে ফিরিয়ে আনেন। আর নিজে চলে যান আদর্শ গ্রাম পত্তন করে নতুন জীবন যাপন করতে। মানুষ হিসাবে মুশাকোজির তুলনা নেই, কিন্তু ছোট গল্পে শিগা অদ্বিতীয়। উপন্যাসেও শিগা গভীরতম। মানুষের প্রতি, প্রাণের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা। হৃদয়টা বোধিসত্ত্বের।

ন্যাচারালিস্টরা লোক খারাপ ছিলেন না। পদ্ধতিটা তাঁদের যাই হোক না কেন মনটা মহৎ। তাঁদের আর এক ঝাঁক বিরুদ্ধবাদী হলেন এপিকিউরিয়ান, ডেকাডেন্ট, satanist প্রভৃতি ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত লেখকরা। এঁদের মূল সূত্র হলো আর্ট ফর আর্টস সেক। ভিতরে ভিতরে এঁরা রোমান্টিক। তথা ইন্দ্রিয়ভোগী। ন্যাচারালিস্টরা যেমন বৈজ্ঞানিকের চোখে জীবনকে দেখতে চান ও বৈজ্ঞানিকের মতো লিখতে চান এঁরা তেমন না। আবার মহান কোনো আদর্শকেও এঁরা আর্টের ঘাড়ে চাপাবেন না। বোদলেয়ার, অস্কার ওয়াইল্ড, পো প্রভৃতি এঁদের গুরু। ক্রমে ক্রমে এঁরা জাপানী গুরু বরণ করেন। মধ্যযুগের জাপানী। আদিযুগের জাপানী। মেইজি আমলের অগ্রণী ভাবুকদের

নাম করতে গেলে যাঁর নাম সহজে মনে আসে সেই মোরি ওগাই বহুকাল নীরব থাকার পর যখন আবার লিখতে আরম্ভ করেন তখন এই মার্গই হয় তাঁর মার্গ। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে নিজের ছেলেদের শিক্ষার জন্যে নিজের যৌন জীবনী লেখা যে-কোনো সাহিত্যে দুঃসাহসিক কাজ। মোরি ছিলেন মিলিটারী ডাক্তার। জার্মানীতে শিক্ষিত। নাগাই কাফু আমেরিকা ও ফ্রান্স থেকে ফিরে ন্যাচারালিজম ছেড়ে ক্রমে এই মার্গে ভিড়লেন। দেশটাকে ধ্বংস করেছে মিলি-টারিস্টরা। দেশের আর কোনো আশা নেই। হতাশ হয়ে নাগাই তো বিদ্রোহ করবেন না। জাপানের গুপ্ত বৃন্দাবন যে গেইশা মহল সেইখানে গিযে লুপ্তপ্রায় সৌন্দর্য সন্ধান করবেন অস্তমিত মধ্যযুগের। না, এই যুগটাই তাঁর পছন্দ নয। এই সব কেজো মানুষের জাপান, সফল মানুষের জাপান তাঁর মনোমতো নয। তাঁকে মুগ্ধ করে ডেকাডেন্স। অমূল্য সৌন্দর্যের ধ্বংসাবশেষ।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছেন তানিজাকি জুনিচিরো। শিল্পী হিসাবে অতুলনীয়। যশের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে যেখানে এসে ইনি পৌঁছেছেন সেখানে এক শিগা নাওইযা ভিন্ন এঁর শরিক নেই। জাপানে চিরাচরিত ইন্দ্রিযভোগ্য সৌন্দর্যের সাধনায ইনি নিরলস। শিগার মতো মানবপ্রেমিক নন। মানবীপ্রেমিক। এই তো সেদিন একখানা নভেল লিখলেন। শয়নকক্ষের বিশদ বর্ণনা। তানিজাকির নায়িকারা মহিষমর্দিনী না হোক পুরুষমর্দিনী। সাম্যবিশ্বাসীরা বলবেন, মেয়েরা কেন চিরকাল দাসী হবে, চিরকাল ছোট হবে? ফেমিনিস্টরা বলবেন, মেয়েরা কেন পুরুষের সমান অধিকার পাবে না? তানিজাকি এর উত্তর দিযে রেখেছেন। মেয়েরাই প্রভু। তারাই বলবতী। তারাই বড়। সমান অধিকার যদি পেতে হয় পুরুষকেই পেতে হবে। তার জন্যে সারাজীবন দাসত্ব করলেই যথেষ্ট হবে না, চোখ জোড়াকে

শলা দিয়ে বিঁধে গান্ধারীর উপযুক্ত স্বামী ধৃতরাষ্ট্র হতে হবে। শুন্‌কিন নাম্নী অন্ধ কোতোবাদিকার স্বামী—আহা! স্বামী কেন! স্বামী তো প্রভুত্ববাচক সম্পর্ক!—অবিবাহিত চাকর সাস্থকে কেবল নারীদাস হয়ে মন পেলো না। হতে হলো সুরদাস। ইতিমধ্যে সন্তানগুলিকে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের চাষীদের দিযে আসা হয়েছে। কাহিনীটা বিগত জাপানের সৌন্দর্যে ভরপুর। কে বলবে যে লেখক রুশোর "স্বীকারোক্ত" পড়েছেন! শুন্‌কিনের মৃত্যুর পরেও সাস্থকে পরম বিশ্বস্ত ছিল। আদর্শ সতী পুরুষ। জাপানীরা কেন যে ও রকম হয় না!

শিগা, তানিজাকি প্রভৃতির উদয় মেইজি সূর্যাস্তের পূর্বে। তখনকার দিনের মনীষীদের নৈরাশ্য থেকে এঁরা নানাভাবে আত্মরক্ষা করেন। মেইজির পরে যিনি সম্রাট হন তাঁর আমলকে বলা হয তাইশো আমল। মাত্র চোদ্দ বছর পরে সে আমল শেষ হয়ে যায়। তার পরবর্তী সম্রাটের আমলের নাম শোওয়া আমল। এ আমল চলছে। জাপানে সাল গণনা হয় আমল অনুসারে। এখন শোওয়া অব্দ তেত্রিশ। জাপানী সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয় বাদশাহী রাজ্যকাল পরম্পরায়।

তাইশো আমলের ঝাঁকগুলির মধ্যে প্রথম নিও-রিয়ালিস্ট। বিভিন্ন ঝাঁক থেকে উড়ে আসা পাখীদের নিয়ে এই ঝাক গড়ে ওঠে। এটি একটি বিপুল গোষ্ঠী। লেখকেরা সকলেই নৈরাশ্যের ও নেতিবাদের বৈতরণী পার হয়ে এসেছেন অথবা হতে চান। ন্যাচারালজিমে তাঁদের আস্থা টলেছে, অথচ তার বিরুদ্ধতা করেও তাঁদের তৃপ্তি নেই। তাঁরা রিয়ালিটি থেকে দূরে সরে যেতে নারাজ, অথচ রিয়ালিটিকে মানুষের প্রয়োজন বা অভিরুচির অনুগামী করতে অক্ষম। দেশ যেদিকে চলেছে তাতে তাঁদের অবিশ্বাস, অথচ সংশোধনের জন্যে তাঁরা রাজনীতিক বা সামাজিক কাজ করবেন না। সাহিত্যে বড় বেশী কল্পনা, বড় বেশী আদর্শবাদ, বড় বেশী অবক্ষয়বাদ লক্ষ করে তাঁরা ক্ষুণ্ণ। অথচ তাঁরাও

মনে মনে বৈরাগী, তাঁরাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বাস্তবকে চাই, অথচ বাস্তবকে সহ্য করাও যায় না। নিও-রিয়ালিস্টরা শেষ পর্যন্ত দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল যেদিকে ঝুঁকলেন সেটা হলো অন্তর্জীবন, অন্তরের শৃঙ্খলা, জাপানের ঐতিহ্য যাকে বলে 'শিন্‌কিযো-শোসেৎসু'। গভীরতর নীতি ও সত্যিকার ধর্মের জন্যে এঁদের ব্যাকুলতা। অন্যধারার লেখকেরা জীবনের ছোটখাটো আনন্দের মধ্যে একপ্রকার স্থিতি একপ্রকার ইতি লাভ করলেন। বাগান তো আছে, ফুল তো আছে, প্রজাপতি তো আছে, আর্ট তো আছে। এসব যদি থাকে তো এই সব নিয়েই থাকা যাক। নেতিবাদী হয়ে কী হবে? আর খুঁজে মরাই বা কেন? মনটাকে হালকা কর, বাবাজী। সহজ হও। সহজে নাও। সহজে দাও। একটুখানি হাসো। অত বিমর্ষ কেন?

তাইশো আমলের প্রথম ঝাঁকের সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই প্রখ্যাত হয়েছেন। বিশেষ করে জনাকয়েকের নাম যদি উল্লেখ করতে হয় তবে এই তিনজনের। সাতো হারুও। কবি রূপেই অধিকতর প্রসিদ্ধ। কান কিকুচি। নাট্যকাররূপেই অধিকতর জনপ্রিয়। "পিতা ঠাকুরের প্রত্যাবর্তন" যেমন মজাদার তেমনি করুণ। আকুতাগাওয়া রিয়ুনোস্কে। "রাশোমন" নামক গল্প লিখে অমর। কিন্তু আত্মহত্যা করে সকল দাহ থেকে পালান। আধুনিক জাপানী সাহিত্যে এটি একটি প্রতীকী ঘটনা। এটি ঘটে তাইশো আমলের অবসানের পর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও মিলিটারী ফাসিস্ট পরিণামের পূর্বাহ্নে। জাপানের যে অসুখ সে অতি দুঃসাধ্য অসুখ। সেই অসুখে ধরেছিল আকুতাগাওয়াকে। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি জীবনের হাল ছেড়ে দেন। যদিও তখন একজন দলপতি ও পরম প্রতিশ্রুতিমান।

তাইশো আমলের দ্বিতীয় ঝোঁক হলো সমাজসচেতন সাহিত্য। নাইহিলিস্ট, অ্যানারকিস্ট, খ্রীস্টীয় শান্তিবাদী ও সোশিয়ালিস্ট লেখক মেইজি আমলেও ছিলেন। তাইশো আমলে দেখা গেল কমিউনিস্টও আছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রুশবিপ্লবের পরে প্রোলিটারিয়ান সাহিত্য বলে এক সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। সাহিত্য যেখানে এসে ঠেকেছে সেটা একটা চোরাগলি। তাকে উদ্ধার করতে পারে জীবন। যদি জীবনকে উদ্ধার করে সাহিত্য। কারণ জীবনও তো পথ পাচ্ছে না ইতিহাসের এই বাঁকে। ক্ষেত মজুর আর কল মজুরদের জাগাতে হবে। তারা তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব বুঝে নেবে। সমাজ বদলাবে। সমাজ বদলালে জগৎ বদলাবে। জগৎ বদলালে সাহিত্য বদলাবে। মোটামুটি বামপন্থী সাহিত্যিকদের এই হলো দাঁড়াবার জায়গা। ক্রমে দেখা গেল এঁদের খোঁয়াড়ে অ্যানারকিস্টদের ঠাঁই নেই। আছে কেবল কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের স্থান। তারপর দ্বৈরথ বেধে গেল সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের। "বুন্‌সেন" দলের সঙ্গে "সেন্‌কি" দলের। "বুন্‌সেন" চললেন বনবাসে। অনেক নতুন লেখক এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পান। জাপানী সাহিত্যে এঁরা নতুন স্রোত নিয়ে আসেন। যদিও আর্ট এঁদের হাতে হাতিয়ার মাত্র তবু সাহিত্যে স্থায়িত্বের দাবী করতে পারে এমন রচনাও এঁরা নেহাত কম লেখেননি। "কাঁকড়া ধরার জাহাজ" বলে একখানি অপূর্ব বই লেখেন কোবায়াশি তাকিজি। শোওয়া আমলের গোড়ার দিকে লেখা এই উপন্যাস দাগ রেখে যায়। কমিউনিস্ট বলে পরে এঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাগারে এঁর মৃত্যু হয়। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রোলিটারিয়ান সাহিত্যিকরা আশাবাদী। কিন্তু তাঁদের সেই আশাবাদে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীদের নৈরাশ্য একটুও কমল না। কারণ

এ জগৎটা এত সরল নয় যে শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা এলেই মানব-জীবনের মৌলিক যন্ত্রণাগুলোর নির্বাণ ঘটবে। আছে মৃত্যু, আছে দুঃখ, আছে বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যভিচার, আছে জারজতা ও জন্মগত কলঙ্ক, আছে দৈব দুর্ভোগ ও মানবিক অপরাধ, আছে পাপ, আছে মিথ্যা, আছে ভিতরে ও বাইরে নরক। কোথাও কোনো সহজ সমাধান নেই। কেন তাহলে আর্ট তার নিজের এলাকা ছেড়ে রাজ-নীতির এলাকায় পা বাড়াবে? প্রোলিটারিয়ান সাহিত্যের জবাব হলো নব্য আর্ট আন্দোলন। এটা শোওয়া আমলের প্রথম ঝাঁক। ইতিমধ্যে তাইশো আমলে আরো কয়েক ঝাঁক পাখী উড়ে গেছে। তাদের এক দলের নাম নিও-ইম্‌প্রেসনিস্ট। মানুষের জীবন ক্ষণে ক্ষণে গতিশীল, ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন। বস্তুর আঘাতে জীবনস্রোত থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে। আমরা আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে তার স্বাদ নিচ্ছি। আমাদের এই ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়প্রত্যয় থেকেই আমাদের বিচিত্র সৃষ্টি। এই তত্ত্বকে জাপানী ভাষায় বলে "শিন্‌কান্‌কাকু"। নিও-ইম্‌প্রেসনিস্টরা স্বদেশের এই তত্ত্বের আশ্রয় নিলেও তাদের প্রয়োগ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার থিয়োরিগত ভিত্তি খুঁড়ে বার করতে হলে ইউরোপে যেতে হয়। গোটা পাঁচেক পশ্চিমী তত্ত্বের পাঁচ-মিশেলী ঘটেছে এতে। তাদের নাম কিউবিজম, ফিউচারিজম, এক্সপ্রেসানিজম, কম্পোজিশনালিজম, দাদাইজম। জাপানী সাহিত্য ইউরোপকে ছেড়ে এক পাও হাঁটতে পারে না, যদিও শুধুমাত্র ইউরোপকে অবলম্বন করতেও তার বাধে। যখনি দেখে কোথাও আটকে যাচ্ছে অমনি জাপানী ঐতিহ্যের কোনো এক তত্ত্বের শরণ নেয়। ওই যেমন 'শিন্‌-কান্‌কাকু'। নিও-ইম্প্রেসনিস্টদের মধ্যে দু-জন বড় লেখক হয়েছেন। য়োকোমিৎসু রিইচি। কাওয়াবাতা য়াসুনারি।

নব্য আর্ট অন্দোলনের নায়কদের লক্ষ্য হলো প্রোলিটারিয়ান সাহিত্যিকদের স্থূলহস্তাবলেপ থেকে সাহিত্যের স্বধর্ম রক্ষা। সমাজ সচেতনতা নয়, আত্মসচেনতা: এই হলো এঁদের ধুয়ো। এঁদের নিজেদের মধ্যে সংহতির আর কোনো সূত্র ছিল না। তাই এঁরা অচিরেই দুভাগ হয়ে যান। নিও-সোশ্যাল ও নিও-সাইকোলজিকাল। অবচেতনকে নিয়ে কেউ কেউ লেগে গেলেন। ফ্রয়েড, জয়েস, প্রুস্ত, ভালেরি, জিদ কারো কারো গুরু হলেন। সুররিয়ালিজম করে দেখা গেল। শেষ পর্যন্ত আবার সেই নৈরাশ্য ও বৈরাগ্য। শরণ নিতে হলো রুশ জীবনদার্শনিক চেস্টভের। অস্বস্তির দর্শনের। এর পরে পশ্চিম আর জাপানের আত্মাকে আলো দিতে পারল না। যাঁরা একদিন হৈ হৈ করে ইউরোপের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা ধ্যানস্থ হলেন জাপানী পদ্ধতিতে। এর থেকে যে অধ্যায়টি এলো তার নাম 'রেনেসাঁস'। তা বলে পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের সঙ্গে মিল নেই। সুন্দর সুন্দর বই লেখা হতে লাগল। লিখতে লাগলেন যাঁরা তাঁরা নানা বিদেশী মতবাদের ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে দেশের অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। ওদিকে প্রোলিটারিয়ানদের ফাটক হয়েছে। মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করে চীন গ্রাস করতে বাহু হাঁ করেছে। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের বিচ্ছেদ প্রায় সমাপ্ত। এমন সময় ঘটল কিনা 'রেনেসাঁস'। শিমাজাকি তোসন, নাগাই কাফু, তানিজাকি জুনিচিরো, শিগা নাওইয়া প্রভৃতি মহারথীদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি এই সময় প্রকাশিত হয়। উর্ধ্বে উঠেছেন এঁরা ভবযন্ত্রণার, অন্তর্জীবনে লাভ করেছেন বোধি ও সমাধি। ঘটে গেছে এঁদের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম। শরণ্য এঁদের সেই মহাতত্ত্ব: 'শিন্‌কিয়ো-শোসেৎসু'।

এই রকম আর একটি মহাতত্ত্ব হলো হেইয়ান যুগের অর্থাৎ হাজার বছর আগের "মোনো নো আওয়ারে"। দৃশ্যের সঙ্গে দ্রষ্টার একাত্মতা।

অনুভূতিযোগ। এ এক প্রকার যোগসাধন। কাওয়াবাতা অবচেতন মনের অতলে নেমে যা পাবার তা তো পাশ্চাত্ত্য মতে পেলেন। এবার পাবেন প্রাচ্য মতে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে। এমন সময় যুদ্ধ বেধে গেল ইউরোপে। তার ছায়া পড়ল জাপানে। তার পর জাপান হানা দিল পার্ল হারবারে। বিষম গোলমালের মধ্যে সাহিত্যের খেই গেল হারিয়ে। ইউরোপের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে জোড় কেটে গেছে। তার কাছ থেকে নতুন কিছু পাবার ছিল না। অথচ স্বদেশের দিকে তাকিয়ে বর্তমানের অন্ধকারে দিশা মেলে না। বড় বড় লেখকরা কলম থামালেন। যাঁরা লিখলেন তাঁরা ছাপালেন না। তবে পাঠক সাধারণকে পাঠ্য যোগানো বন্ধ রইল না। কতক লেখক দায়ে পড়ে ফাসিস্ট। বেশীর ভাগ পেশাদার লেখক। লিখে যাঁদের হাঁড়ি চড়ে। জাপানের পুরাণ, কিংবদন্তী, ইতিহাস থাকতে উপকরণের অভাব কোথায়? পুরোনো গ্রন্থ নতুন করে লেখাও একটা কাজের মত কাজ। সেসব গ্রন্থের ভাষা এমন অপ্রচলিত হয়ে গেছে যে, একালের ভাষায় না লিখলে লোকে বুঝবে না। যেমন "গেন্‌জি মোনোগাতারি"র ভাষা। তা ছাড়া যুগোপযোগী করতে হলে অনেক বাদসাদ দিতেও হয়, অনেক জোড়া-তালি না দিলেও চলে না। সেই সূত্রে জাতির আত্মার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হয়ে যায়। অনুকরণ পর্বের পরিণাম তো দেখা গেল।

যে বৃত্তের আরম্ভ ১৮৬৮ সালের মেইজি অভ্যুদয়ে তার সমাপন ১৯৪৫ সালে হিরোশিমার পরমাণু বোমার মার খেয়ে বিনা শর্তে আত্ম-সমর্পণে। দোষ কেবল রণপতি ও ধনপতিদের নয়, দোষ জাপানের সকল শ্রেণীর। লেখকদেরও। কেবল বামমার্গীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই যথেষ্ট নয়। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোও দরকার। তাতে অবশ্য দক্ষিণা কম পড়ে। হয়তো অনশনে মরতে হয়। হয়তো কারাগারে। রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে না পড়েও এ কাজ করা যায়। রলাঁ করেছেন,

রবীন্দ্রনাথ করেছেন, বার্নার্ড শ করেছেন, টলস্টয়ের তো কথাই নেই। এঁরাই ধরিত্রীর লবণ। যে সাহিত্যে এঁদের মতো লেখক নেই, সে সাহিত্যে একটা উপাদান নেই। তার নাম লবণ। অথচ সে সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে ফুকুজাওয়া যুকিচি সম্ভব হয়েছেন। তার পর, জোলা কি কেবল ন্যাচারালিজম করেছিলেন? ড্রেফু নামক এক অচেনা অজানা ইহুদী সৈনিকের প্রতি যে অন্যায় দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থভাবে একক সংগ্রাম করেননি? জীবনপাত করেননি? তাঁর সংগ্রামিতার অনুকরণ করতে এগিয়ে এসেছেন কে?

যুদ্ধের সময় জাপানীদের মনোবল অটুট ছিল। কিন্তু পরাজয়ের পর একেবারে ভেঙে পড়ল। একটা মহান জাতির এই অধঃপতন চোখে দেখা যায় না। শারীরিক ধ্বংস এর কাছে কিছু নয়। কায়িক ক্ষত এর মধ্যে মিলিয়ে এসেছে, কিন্তু আত্মিক অবক্ষয়ের চিহ্ন এখনো পরিস্ফুট। কেউ বসে নেই। লেখা নিত্য চলেছে। জাপানে যত লেখক বোধ হয় সারা ভারতেরও তত নয়। প্রত্যেকেই নিজের লেবেল সম্বন্ধে সচেতন। লেবেলহীন লেখক বড় কম। লেবেল মাঝে মাঝে বদলায়। গোত্রান্তর ঘটে। সাহিত্যিক মহলের চমকপ্রদ খবর বলে একে। কথা বলার স্বাধীনতা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী। জীবনযাত্রাও আগের তুলনায় আরো স্বাধীন। আর্থিক স্বাধীনতাও বেড়েছে। জাপানী বই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কাটে। বাড়ির ঝি-রাও বই কাগজ কেনে ও পড়ে। মজদুর চাষারাও। স্ত্রীশূদ্রের জাগরণ যুদ্ধের মাঝখানেই ঘটে। যুদ্ধের পরে তো তারা ঘুমোবার নাম করছে না। মিলিটারি বাবাজীরা ঠাণ্ডা। ক্যাপিটালিস্ট বাবুরা হুঁশিয়ার। কন্‌ফিউসিয়ান সমাজ ব্যবস্থা গোল্লায় গেছে। অত দূর না গেলেও পারত। এটাও একটা গোধূলিকাল। সমাজের দিক থেকে। নতুন একটা স্থিতি আসতে সময় লাগবে। পুরাতন সেই স্থাবরতা কিন্তু ফেরবার নয়।

সাহিত্যিকদের মনেও সমসাময়িক অস্থিরতা। বিষাদ যদিও আছে নৈরাশ্য আছে বলে মনে হয় না। মেইজি সূর্যাস্তের ক্ষণ থেকে সেই যে হতাশার সঞ্চার হয়, সেটা যেন খেলা মাৎ হয়ে যাবার পূর্ব সঙ্কেত। খেলা যখন মাৎ হলোই তখন আর হতাশার কী আছে? এখন নতুন করে আশায় বুক বাঁধতে হবে। লোকে কল্যাণময় রাষ্ট্রের কল্পনা করছে। ইংলণ্ডের মতো। এর জন্যে সাম্রাজ্যের বা উপনিবেশের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সুব্যবস্থার। লোকে আশা করে গণতন্ত্র তাদের সুব্যবস্থা দেবে। জাপানী গণতন্ত্র আমাদের গণতন্ত্রের সমবয়সী। তার সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দেবার মতো অবস্থা এখনো আসেনি। কেউ চায় না যে, আবার সেই রণতন্ত্র ফিরে আসে। সমাজতন্ত্র যারা চায় তারাও গণতন্ত্রের ভিতর দিয়েই চায়। বিপ্লব অনিবার্য এ ধারণা যারা পোষণ করে তাদের প্রতিপত্তি অতি ক্ষীণ। সম্রাট এখন মাটিতে নেমে এসেছেন। দেবতা ছিলেন, মানব হয়েছেন। দারুণ জনপ্রিয়। অথচ সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন।

যুদ্ধোত্তর জাপানী সাহিত্যের হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। এক রাশ নাম দিতে পারি, কিন্তু জ্ঞান তাতে বাড়বে না। মোটামুটি বলা যেতে পারে, আগের মতো সেই সব ঝোঁক নেই। কেউ অতটা নিশ্চিত নয় যে বিশিষ্ট একটা ঝোঁক গড়তে বসবে। অপর পক্ষে লেখকরা জোট বাঁধতে শিখেছেন। ইংলণ্ডের পরে জাপানের পি. ই. এন. ক্লাবের সদস্যসংখ্যা বেশী। প্রায় সব রকম মতের লেখক সেইখানে জড়ো হয়েছেন। কমিউনিস্টদের যদিও প্রবেশ নিষেধ। তবু কয়েকজনকে দেখি যারা একদা ঘোর কমিউনিস্ট ছিলেন। ত্রিশ বছর আগে প্রোলিটারিয়ান সাহিত্যের নেতা ছিলেন আওনো সুএকিচি আর হিরাবায়াশি তাইকো। আওনো এখন পি. ই. এন.-এর অন্যতম সহ-সভাপতি। আর কুমারী হিরাবায়াশি এখন তাঁর কর্মসমিতির সভ্যা। এঁদের এককালে যিনি

বিরুদ্ধবাদী ছিলেন নিও-ইম্প্রেসানিস্ট দলের অন্যতম প্রধান সেই কাওয়াবাতা য়াসুনারি এখন পি. ই. এন.-এর সভাপতি। মনে হয় সকলেই যে যার জেদ ছেড়ে কিছু পরিমাণে উদার হয়েছেন। কিন্তু যে যার কোট বজায় রেখেছেন।

যুদ্ধের পর প্রোলিটারিয়ান লেখক সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। নতুন স্বাধীনতা লাভ করে র‍্যাডিকাল, লিবারল, সোশিয়ালিস্ট ও কমিউনিস্ট লেখকরা একজোট হন। এঁদের সংস্থার নাম নয়া জাপান সাহিত্যিক সমিতি। প্রায় সব পুরোনো প্রোলিটারিয়ানকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিয়ামোতো য়ুরিকো। যুদ্ধের সময় এই মহিলার সাহিত্যকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের পর ইনি লেখেন খানতিনেক বই, তার পর মারা যান। "বান্‌শু সমতলভূমি" বলে এঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বেশ প্রসিদ্ধ। জাপানের আত্মসমর্পণের সেই ঐতিহাসিক দিবস—সেটিও একটি ১৫ই আগস্ট—থেকে আরম্ভ। জাপানের তখনকার দিনের মহাবিশৃঙ্খলার প্রত্যক্ষ দর্শনের বর্ণনা। সারা দেশে সুখী কেবল কোরিয়ান নজর-বন্দীরা। তারা বাড়ি ফিরবে। আর লেখিকা স্বয়ং। তাঁর স্বামীকে ফাসিস্ট সরকার বারো বছর বন্দী করে রেখেছিল। তিনি মুক্ত হবেন। কিন্তু সে সুখে কাঁটা। দেওর নিহত হয়েছে হিরোশিমায়। লেখিকা স্বামীকে আনতে হোক্‌কাইদো যাচ্ছিলেন। উল্টো দিকে ছুটতে হলো হিরোশিমা। ফিরলেন বান্‌শু সমতলভূমি দিয়ে মালগাড়িতে চড়ে।

যুদ্ধে যাঁরা গেছলেন তাঁদের কেউ কেউ যুদ্ধের কাহিনী লিখে প্রখ্যাত হন। এ রকম একজনের নাম ওওকা শোহেই। "সমতলভূমিতে অগ্নি" এঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। ঘটনা ঘটছে ফিলিপাইন দ্বীপে। জাপানী সৈনিকরা হেরে গেছে। তাদের কয়েকজন বন্দরের দিকে পালাচ্ছে। শুনেছে বন্দর এখনো জাপানীদের দখলে। এই পলাতক সৈনিকরা

ক্ষুধার দায়ে নরমাংস ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে ছিল তামুরা। সে চোখে আগুন দেখে। আগুন কিন্তু পার্থিব নয়। দেহে মনে আত্মায় অক্ষত থাকতে চায় তামুরা। অবশেষে পৌঁছে যায় গির্জায়। কিন্তু সেখানে ঘটে গেল এক অঘটন। তার গুলিতে মারা পড়ল একটি ফিলিপিনো যুবতী। তামুরা অস্ত্র ছুড়ে ফেলে দিল। প্রতিজ্ঞা করল আর নরমাংস খাবে না। ঈশ্বরের কৃপায় তার ডান হাত পক্ষাঘাতে অসাড় হলো। কিন্তু আবার তার হাতে এলো সেই বন্দুক। এবার ঘটল আবেক অঘটন। বন্ধুহত্যা। মাংসই ছেড়ে দিল তামুরা। মাংস বলতে কেবল আহার্য নয় ভোগ্য। এমনি করে তার পাপমোচন হলো।

যুদ্ধেব তিন বছর পরে দাজাই ওসামু আত্মহত্যা করেন। বার বার তিন বার ব্যর্থ। চতুর্থ বার অব্যর্থ। তাঁর শেষ উপন্যাস "আর মনিষ্যি নয়" কতকটা তাঁর নিজের জীবন। সম্পন্ন পরিবারের বাপে খেদানো ছোট ছেলে তোকিয়োতে এসে ছাত্র হয। ভয় পায। হারিযে যায়। তার পব পাতালে এক ঋতু। কমিউনিজম। মদ। ত্যজ্যপুত্র। নারীসঙ্গ। আত্মহত্যার বৃথা চেষ্টা। করবার মতো কাজ নেই, করবেই না। এবার রক্ষিতাগ্রহণ নয, অধিকবযসী বারমেডের দ্বারা রক্ষিত। আত্মসম্মানহীন ভাঁড। মদের চেয়ে আরো সাংঘাতিক নেশা শুরু। পাগলা গারদে এক ঋতু। পরিবারের লোক ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিযে নিয়ে যায। আর মনিষ্যি নয। নিজের কাহিনীর রোজনামচা লিখত। উপক্রমণিকায ও উপসংহারে নিজের পরিস্থিতিটা বোঝাতে চায়। এটা তার জবাবদিহি। তার বকলমে দাজাইর। টুর্গেনিভের "বাপেরা আর বেটারা" যে বিরোধের কথা বলেছে, সে বিরোধ জাপানেও দেখা দিযেছে। অনুকরণ করে নয়। কালক্রমে। বাপের যা বিশ্বাস ছেলের তা নয়। বাপের যা নীতি ছেলের তা

নয়। অথচ পূর্বপুরুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তো মূলোচ্ছেদ। জাপানের তরুণরা অমূল তরু। তাদের নিজেদের বিশ্বাস নিজেদের নীতি যতদিন না তাদের নিজেদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে ততদিন তারা লক্ষ্যহীন ভাবে ভেসে বেড়াবে। দাজাই আত্মঘাতী হলেন জলে ডুবে। এটাও প্রতীক। আর ভেসে থাকতে পারলেন না বলে ডুবলেন।

দাজাইর চেয়ে যারা আরো তরুণ তাদের একজন ইশিওয়ারা শিন্তারো যুদ্ধের বছর নয় পরে "সৌর পরিবার" লিখে জাপানী সাহিত্যে আবধৌতিক সাফল্য লাভ করেছেন। বাপেরা বোধ হয় বেটা ও বেটিদের সায়েস্তা করার আশা ছেড়ে দিয়েছে। হয়তো তারাই সায়েস্তা করবে বাপেদের। বিশৃঙ্খলার পরের ধাপ উচ্ছৃঙ্খলতা। ইশিওয়ারা নিজে খুঁজছেন একটা নৈতিক ভিত্তি। যা গতানুগতিক নয় অথচ নির্ভরযোগ্য। তাঁর লেখার শৈলী হেমিংওয়ের দ্বারা প্রভাবিত। আগেকার দিনের সাহিত্যিকরা তাকাতেন ফ্রান্সের দিকে। এখনকার সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আমেরিকার দিকে। হেমিংওয়ে, স্টাইনবেক ইত্যাদির দিকে। ইশিওয়ারা আরো বই লিখেছেন। আরো কয়েকটি সোনার খনি। লক্ষ্মী যেন তাঁকে ছাড়তেই চান না। এমন ছেলেকে কোন্ বাপ প্রাণ ধরে ত্যজ্যপুত্র করবে! শুনেছি ভালো বিয়ে হয়েছে ' অবশ্যম্ভাবী।

আধুনিকতম জাপান কেবল কাম অ.র অর্থ নিয়ে পাগল নয়। ধর্ম আর মোক্ষ নিয়েও পাগলতর। যুদ্ধের পর "সাপ আর ঘুঘু" বলে একখানি উপন্যাস লিখেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক নিওয়া ফুমিও। ঘুঘু অবশ্য বাংলা অর্থে নয়। যুদ্ধোত্তর জাপানে সাত-শটি নতুন ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে। রেজিস্টারি করা। তা ছাড়াও আছে আরো কয়েক শত নবীন ধর্ম। নিওয়া লিখেছেন এমনি একটি ধর্মের কাহিনী। ধর্মসম্প্রদায়ের নাম "বেগুনী মেঘ কল্যাণসমাজ"। এর সংস্থাপক

কোকুনে নামক এক উচ্চাভিলাষী ব্যবসাদার। বাজার ভালো দেখে ধর্মের ব্যবসায় অর্থ খাটাতে চায়। সহকারী ওগাতাকে পাঠায় গুরু খুঁজতে। গুরু হবে সুপুরুষ, যার যৌন আবেদন আছে, যাকে সাদা কিমোনো পরলে সুন্দর দেখায়। লাগে টাকা দেবে কোকুনে। নারকোটিকের কারবার থেকে সে ফেঁপে উঠেছে। গুরু মিলে গেল খুজতে খুঁজতে বহুভাগ্যে। আসাকা তার নাম। রোগ সারিয়ে দেয় বিশ্বাসের জোরে। সাদা কিমোনো পরলে রূপ আর ধরে না। মেয়েরা তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না। সেও পারে না মেয়েদের প্রতিরোধ করতে। মাতৃত্বের উপক্রম ঘটে এক তরুণীর। পুলিসে টানাটানি করে। কোকুনে কিছু অর্থ ব্যয় করে এই বিপত্তি থেকে আসাকাকে উদ্ধার করে। সে তখন কোকুনের ইচ্ছামতো গুরু বনে যায়। সম্প্রদায় জমে ওঠে। আসাকাকে নিয়ে মেয়েমহলে লোফালুফি। অনেক কাণ্ড। প্রচুর তথ্য পরিবেশন করছেন নিওয়া। কাল্পনিক নয়।

ধর্মের জন্যে আকুলতা যেমন বহু নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছে, তেমনি পুরাতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছে অস্তিত্ববাদের দিকেও মনোযোগ গেছে। শিইনা রিন্‌জো ছিলেন ঘরছাড়া খেটে খাওয়া নিম্নতম স্তরে মেশা কমিউনিস্ট। জেলে থাকতে তাঁর বিশ্বাসান্তর ঘটে। যুদ্ধের পর তিনি লেখেন "মধ্যরাত্রির ভোজ" বলে একটি উপন্যাস। ডস্টইয়েভস্কির ছাঁদে। যুদ্ধোত্তর জাপানে নাইহিলিজিমের বিভিন্ন লক্ষণ বিশ্লেষণ করে তিনি অস্তিত্বের মর্ম অন্বেষণ করতে বসেন। লেখা হয়ে গেল আরো তিনখানা বই। কিয়েরকেগার্ড প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের প্রভাবে। তার পর তিনি খ্রীস্টান হন। "চিরন্তন প্রস্তাবনা" বলে তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাস অন্ধকার জগতে আলোর রেখা খুঁজে মরা। পরিশেষে নায়ক য়াসুতা বলছে, "মানুষ কী করে সত্যিকার বিপ্লবী হবে, যদি না ভালোবাসতে পারে কুশ্রীতাকে ?"

এরকম সিদ্ধান্ত য়াসুওকা শোতারু পছন্দ করেন না। যুদ্ধ থেকে ফিরে ইনি এঁর অভিজ্ঞতা নিযে গল্প লেখেন। যে জগৎ এঁর হাত দিয়ে ফোটে সে এক সিম্বলিক জগৎ। কাফ্‌কা যার পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে কতকটা মেলে। দৈনন্দিন জীবনের ভিতর দিয়ে চলে শূন্য এক সত্তা। জাপানী ফৌজের একঘেয়ে অমানুষিক জীবন। অত্যন্ত মোলায়েম সরস করে বলা। একখানি বইয়ের নাম "কুসংসর্গ।" আরেকখানি "প্রফুল্লতাহীন ফুর্তি।" তারপর "গুপ্ত কথা" বলে যে বই লেখেন তাতে অসীম আশা, উৎফুল্ল সুর, ইন্দ্রিয়ভোগ্য সৌন্দর্য।

যুদ্ধের সময় নাকামুরা শিন্‌ইচিরো আটক ছিলেন। কবি হিসাবে এঁর নাম ছিল। যুদ্ধের পর হয ঔপন্যাসিক রূপে। "মৃত্যুর ছায়ায়" বলে ইনি যে উপন্যাস লেখেন তাতে জীবন ও মৃত্যুর, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের দার্শনিক সত্য অন্বেষণ করেছেন। পদ্ধতিটা প্রুস্তের চৈতন্যপ্রবাহ। কখনো বর্তমান কালে কখনো বর্তমান থেকে অতীতে স্মৃতির সরাণ বেয়ে নিঃসঙ্গ মানব চলেছে মৃত্যুর ছায়ায়। এই গ্রন্থের আরো চারটি খণ্ড আছে। তাদের একটির নাম "প্রেমের দেবতা, মৃত্যুর দেবতা।" আরেকখানির নাম "আত্মার রাত্রি"। রিয়ালিটিকে ধরতে ছুঁতে হলে নতুন এক ধ্যানী দৃষ্টি চাই। এই হলো তাঁর যুক্তি।

উমেসাকি হারুও ছিলেন যুদ্ধকালে নৌসৈনিক। যুদ্ধের পর ইনি লেখেন "সাকুরা দ্বীপ" নামে উপন্যাস। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সৈনিকের জীবন ও মন কেমন রূপ নেয় তার বর্ণনা আছে এতে। বিবরণকার বলছেন, "মরতেই যদি হয় অন্তত আমি যেন সুন্দরভাবে মরতে পারি।" নায়ক উদ্বিগ্ন চিত্তে গোপনে অন্বেষণ করছেন মানুষের ভিতরে কী আছে সত্য। আর লড়ছেন সৈন্যজীবনের অসত্যের সঙ্গে। সৈন্যজীবনের পাশবিকতা ও জুয়াচুরির সঙ্গে। এ গ্রন্থের মনোবিশ্লেষণ সাধারণ বাস্তবধর্মী রচনার বহু উর্ধ্বে। এঁর আরো বই আছে। অদ্বিতীয় এঁর টেকনিক।

পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে। কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে হবে। তার আগে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা দরকার। আধুনিক জাপানী সাহিত্য যে পরিমাণে আধুনিক তার চেয়ে অধিক পরিমাণে জাপানী ও তার চেয়েও অধিক পরিমাণে সাহিত্য। অর্থাৎ জাপানী লেখকের সর্বপ্রধান ভাবনা কেমন করে লিখলে লেখাটা সাহিত্য হবে। সাহিত্যই যদি না হলো তবে লিখে সুখ কী? সমাজের মঙ্গল? মোটা আয়? করতালি? সেসব দুর্বলতা নেই যে, তা নয়। তবু লেখা কেমন করে লিখতে হয়, কেমন করে লিখলে রসিকজনের স্বীকৃতি পাবে, খেলা কেমন করে খেলতে হয়, কেমন করে খেললে হেরে গিয়েও সুখ আছে, জাপানী লেখকের কাছে এটা একপ্রকার জীবন মরণ সমস্যা। এর জন্যে সে বোখারা সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে রাজী। এক ফরাসী ভিন্ন আর কোনো জাতের সারস্বতদের ললিতকলাবিধিজিজ্ঞাসা ও রূপ-সচেতনতা জাপানীদের মতো প্রখর নয়। এইজন্যে তারা পদে পদে ফরাসীদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায়। এর একটা কুফলও আছে। কেমন করে লিখব, এ প্রশ্নের উপর অত বেশী জোর দেওয়া উচিত নয়। আধুনিক জাপানের আদি ঔপন্যাসিক ফুতাবাতেই ঠিকই করেছিলেন রুশ গুরুদের কাছে নবীনত্বের শিক্ষানবীশী করে। তখন থেকে টলস্টয়, ডস্টয়ভাস্কি, টুর্গেনিভ প্রভৃতির প্রভাবে বাড়লে আধুনিক জাপানী সাহিত্য তেমনি বিশ্বজনীন হতে পারত।

আধুনিকতার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলেও জাপানী লেখককে লিখতে হয় বিশ্ববাসীর জন্যে নয়, জাপানী পাঠকপাঠিকার জন্যে। পাঠকের চেয়ে পাঠিকার সংখ্যাই বেশী। এটা সেই "গেন্‌জি কাহিনী"র যুগ থেকে। পুরুষেরা পড়তেন চীনা সাহিত্য, জাপানী সাহিত্যের উপর তাঁদের তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। শিক্ষিত বাঙালীরা যেমন ইংরেজী বই পড়েন। বাংলায় কী আছে যে পড়বেন! লেখাপড়ার চল জাপানে

বরাবরই ছিল, তাই সাহিত্যেরও আদর মেয়েমহলে ও বেনেমহলে ছিল। আধুনিক যুগে সেটা জনতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। খাঁটি জাপানী বিষয়বস্তু না হলে তারা রস পায় না। দেশবিদেশের আলো নিয়ে তারা করবে কী। প্রুস্ত বা জয়স বা কাফকা বা কামুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখলে বড় জোর হাজার দশেক পাঠক জুটবে, সেটা জাপানের পক্ষে নগণ্য। "গেন্‌জি" বা "হেইকে" নতুন করে লিখলে তার সঙ্গে মিলিয়ে দশ লাখ পাঠক হাঁ করে গিলবে। দশটা শরৎচন্দ্রকে জুড়লে একটা যোশিকাওয়া এইজি। জাপানী পাঠকরা হাড়ে হাড়ে জাপানী। কমিউনিস্টরাও সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। প্রেলিটারিয়ান লেখকরাও আজকাল ভোল ফিরিয়েছেন। জনতার হাতে যেই টাকা এলো অমনি দেখা গেল যে, ওদের রুচিও সে কালের বেনেদের মতো। গেসাকুতে।

তা সত্ত্বেও আধুনিকতার প্রেস্টিজ সকলের উপরে। চরম প্রশংসার কথা বিষয়ের, শৈলীর ও আঙ্গিকের অভিনবতা। জীবনদর্শনের অগ্রসরতা। হিরোশিমার অর্থানুসন্ধান।

(১৯৬০)

বোরিস পাস্তেরনাক

এমন এক সময় ছিল যখন পাস্তেরনাক বললে লোকে বুঝত প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী লেওনিদ পাস্তেরনাক। মস্কো কলাভবনের অধ্যাপক। টলস্টয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। "রেসারকৃশন" উপন্যাসের ছবিগুলি যাঁর আঁকা। যাঁর পত্নী রোজা কাউফমান বিবাহের পূর্বে পিয়ানো বাজিয়ে নাম করেছিলেন। যাঁর গৃহে টলস্টয় এসেছিলেন কন্যাদের নিয়ে পিয়ানো শুনতে।

এই শিল্পীদম্পতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বোরিস পাস্তেরনাক আজন্ম ললিত-কলায় লালিত। দুই চোখ ভরে দেখেছেন। দুই কান ভরে শুনেছেন। যত রাজ্যের গুণীদের পায়ের তলায় বসেছেন। তাঁর জীবনের গোড়া থেকেই টলস্টয় রয়েছেন তাঁদের বাড়ীর হাওয়ায়। বিশ বছর ধরে তিনি সেই মহাপুরুষের সংস্পর্শের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছেন। একবার টলস্টয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এক বিদেশী যুবা। বোরিস পাস্তেরনাকের বয়স তখন দশ। রেলপথে মস্কো ফিরছেন সপরিবারে। সহযাত্রী ও সহযাত্রিণী হলেন একটি যুবক ও একটি মহিলা। তাঁদের নামিয়ে দেবার জন্যে ট্রেন মাঝপথে থামল। টলস্টয়ের বাড়ী থেকে জুঁড়ি গাড়ী এসে তাঁদের নিয়ে গেল। বালক পাস্তেরনাক তখন জানতেন না সহযাত্রীর নাম, জানতেন না তিনি একজন কবি। আরো দশ বছর পরে একদিন বইয়ের আলমারি সাজাতে গিয়ে দেখেন একখানা বই পড়ে গেছে মেজেতে। তুলে নিযে পড়েন। রিল্‌কের কবিতা। লেওনিদ পাস্তেরনাককে উপহার। পরে একদিন ডাকে এলো রিল্‌কের আরেকখানি বই। এখানিও উপহার। কে এই রিল্‌কে? পিতা বললেন ইনিই সেই সহযাত্রী।

সেকালের রাশিযার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কম্পোজার স্ক্রিয়াবিন একবার পাস্তেরনাকদের কাছাকাছি বাসা নেন এক পল্লীগ্রামে। বালক বোরিস তাঁর বাজনা শুনে এমন মুগ্ধ হলেন যে মনে মনে ঠিক করে ফেললেন বড হযে তিনিও হবেন সঙ্গীতের কম্পোজার। আরম্ভ হয়ে গেল একমনে সঙ্গীত সাধনা। একলব্যের মতো দ্রোণের অগোচরে। আর কোনো পিতামাতা হলে ছেলের খেযালে বাধা দিতেন। কিন্তু বোরিসের পিতামাতা অন্য প্রকৃতির। কম্পোজার হয়ে জীবিকা অর্জনে তাঁদের আপত্তি নেই। ছ'বছর ধরে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গীতসাধনার পর আবার স্ক্রিয়াবিনের সঙ্গে দেখা।

নমুনা শুনে সঙ্গীতনায়ক "হাঁ"-ও বলেন না। "না"-ও বলেন না। শুধু পরামর্শ দেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন না পড়ে দর্শনশাস্ত্র পড়তে। উনিশ বছর বয়সে তরুণ পাস্তেরনাক তাঁর জীবনের প্রথম আঘাত পেলেন যখন বুঝতে পারলেন যে সঙ্গীতে তাঁর ভবিষ্যৎ নেই। তা হলে আছে কিসে? আইনে? নেই। দর্শনে? কে জানে!

একবার আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেলে সহজে জোড়া লাগে না। পাস্তেরনাক হয়তো পথ খুঁজে পেতেন না। নিয়তি সহায় হলো। পদ্মানদী যেমন এক দিক ভাঙে তেমনি আরেক দিক গড়ে। তরুণদের একটি আড্ডায় তাঁকে ডাকা হতো তিনি কবি বলে নয়, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় তাঁর প্রবেশ আছে বলে। সেখানে কবিরাও যেতেন। আলাপ হতো। রিল্‌কের কবিতা আবিষ্কার করার পর একদিন পাস্তেরনাক রিল্‌কে পড়ে শোনালেন। তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণে রিল্‌কের কবিতা যেন ঈশ্বরের দান। এর পরে আরো দু'বছর কেটে গেল। একদিন তাঁর মা তাঁর হাতে দু'শো রুবল দিয়ে বললেন, এ আমার অনেক দিনের অনেক কষ্টের সঞ্চয়। যাও, বিদেশে বেড়িয়ে এসো। পাস্তেরনাকের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত। জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় একেই তো প্রাচীন তার উপর তখনকার দিনে নব্য কাণ্টীয় দর্শনের প্রধান কেন্দ্র। পাস্তেরনাকের মনে সাধ ছিল সেখানে গিয়ে হার্মান কোহেনের কাছে পড়বেন। কিন্তু উপায় ছিল না। অর্থাভাব। দৈবাৎ এই টাকাটা পেয়ে তিনি ঠিক করে ফেললেন গ্রীষ্মাবকাশটা মারবুর্গে কাটাবেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলেন বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় খোলা থাকবে। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অন্যরকম।

মারবুর্গে গিয়ে ভালোই চলছিল। কোহেনের তাঁকে খুব পছন্দ। কিন্তু ঘটে গেল এক বিচিত্র ব্যাপার। এটিও অপ্রত্যাশিত। মস্কোতে তিনি এক বড়লোকের মেয়েকে পড়াতেন। সে ও তার ছোটবোন

বিদেশে বেড়াতে গিয়ে মারবুর্গে হাজির। তাদের সঙ্গে গুরুজন নেই। পুরোনো প্রেম ঝালিয়ে নেবার এই তো সুযোগ। পাস্তেরনাক সাহসে বুক বেঁধে একদিন বলেই ফেললেন কথাটা। "ওগো যাবার আগে বলে যাও আমার কপালে কী আছে।" যতদূর সম্ভব বিনয়ের সঙ্গে প্রিয়া বললেন, "তোমার কোনো আশা নেই।" পরের দিন পাস্তেরনাকের চোখে পৃথিবীর রূপ বদলে যায়। এ হলো তাঁর জীবনের দ্বিতীয় গুরুতর আঘাত। উনিশ বছর বয়সে গেল সঙ্গীত। বাইশ বছর বয়সে গেল প্রেম। কিন্তু কে জানে কেমন করে এলো কবিতা। পাস্তেরনাক আবিষ্কার করলেন যে তিনি কবিতার পর কবিতা লিখে চলেছেন। বিদায় মারবুর্গ! বিদায দর্শনশাস্ত্র! পকেটে সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল। তাই দিযে কোনো রকমে ভেনিস ও ফ্লোরেন্স দেখা হলো। দেশে ফিরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুযেট হলেন ১৯১৩ সালে। সেই বছরই কাব্যে আত্মসমর্পণ করলেন।

পরের বছর প্রথম মহাযুদ্ধ। শাপে বর হলো তাঁর খোঁড়া পা। সেই যেবার পল্লীগ্রামে স্ক্রিযাবিনের সঙ্গ পান সেই বছরই ঘোড়ার থেকে পড়ে পা ভাঙেন। সেরে ওঠার পর দেখা গেল এক পা ছোট। এক পা বড। এমন লোককে তো সৈন্যদলে ভর্তি করা যায় না। সমবয়সীরা সবাই চলল যুদ্ধে লডতে। কবিবন্ধুরাও। ইতিমধ্যে তিনি ফিউচা-রিস্টদের একটি উপদলে যোগ দিয়েছিলেন। উপদলটির নাম "সেন্ট্রিফিউগ।" আরেকটি উপদলের স্বনামধন্য কবি মায়াকোভস্কির সঙ্গে ইতিমধ্যেই তাঁর ভাব হয়। তখনকার দিনে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যটাকেই লোকে বড় করে দেখত। কবিরা নিজেরাও। তাই এক দল আরেক দলকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে বাক্যবাণে জ্বালিয়ে মারত। ইমেজিস্ট বলে একটা দল ছিল। তারা দস্তুরমতো গুণ্ডামি করত। এসেনিন ছিলেন এই দলের সেরা কবি। যেমন গরমপন্থী

ফিউচারিস্টদের মধ্যমণি ছিলেন মায়াকোভস্কি। পাস্তেরনাকের উপদলটা নরমপন্থী। বেশী বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করে অন্যের তুলনায় তিনি পেছিয়েই রয়েছিলেন।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যখন ঘটে পাস্তেরনাক তখন মস্কো থেকে অনেক দূরে উরাল পর্বতের ধারে এক অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় কেরানীগিরি করছেন। সেখান থেকে নিকটতম ডাকঘর হলো ১৭০ মাইল ব্যবধানে। খবরটা পেয়েই তিনি রওনা হলেন তিন ঘোড়ার বরফগাড়ী ট্রোইকায় চড়ে। কাজান। কাজান থেকে রেলপথে মস্কো। সেই বছরই লেখা হয় তাঁর কবিতার বই, "জীবন, বোন আমার।" লেখা হয়, কিন্তু ছাপা হয় না। ছাপা হতে পাঁচ বছর দেরি হয়। কিন্তু যেদিন ছাপা হলো সেই দিনই তাঁর আসন স্থির হয়ে গেল মায়াকোভস্কি ও এসেনিনের সঙ্গে বিপ্লবোত্তর গিরিশিখরে। ব্লক ততদিনে মৃত। সিম্বলিস্ট কবিদের দিন গেছে। য়্যাক্‌মিইস্ট কবিদের নেতা গুমিলিওভ নিহত। তাঁর পত্নী আখ্‌মাতোভা জীবিত, কিন্তু তাঁদের দলটিরও দিন গেছে। শুধু ফিউচারিস্ট ও ইমোজিস্ট এই দুই দলেরই নাম যশ। এঁরা বিপ্লবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু মায়াকোভস্কি ও এসেনিন যেমন বিপ্লবের বাণীমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন পাস্তেরনাক তেমন নন। পাস্তের-নাক কোনো দিনই রাজনীতির মধ্যে ছিলেন না, রাজনীতি নিয়ে একে-বারেই ভাবতেন না। তবে বিপ্লব যে একদিন হবেই এটা তিনি জানতেন সেই ১৯০৫ সাল থেকে, তাঁর বয়স যখন পনেরো বছর। এই বছরের ঘটনা অবলম্বন করে তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। প্রকৃতি ও জগতে যেমন ঝড়ঝঞ্ঝা মানুষের জগতেও তেমনি যুদ্ধ আর বিপ্লব। যারই নাম ঝড়ঝঞ্ঝা তারই নাম যুদ্ধ আর বিপ্লব। এই তাঁর জীবনদর্শন।

পাস্তেরনাক যদি বিপ্লববিরোধী হতেন তা হলে তাঁকে রাশিয়ায় থাকতে হতো না, থাকলে যে কোনো দিন প্রাণ যেতো। একে একে

তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন রাশিয়া থেকে সরে পড়েন। তাঁর মা বাবা চলে যান ১৯২১ সালে। পাস্তেরনাককে চাকরি নিতে হয় লেখকদের বইয়ের দোকানে সেলসম্যান রূপে। "জীবন, বোন আমার" প্রকাশ করে পরের বছর তিনি যশস্বী হন। বিবাহ করেন। বধূকে নিয়ে বার্লিনে যান পিতামাতাকে প্রণাম করতে। বার্লিনে তিনি এক বছর কাটান। সেইখানেই তাঁর পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। সেখানে থাকতেই প্রকাশিত হয় তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "আস্থায়ী আর অন্তরা।" বার্লিনে তথা মস্কোতে, একই কালে। পাস্তেরনাক ইচ্ছা করলে জার্মানীতে থেকে যেতে পারতেন। জার্মান তাঁর কাছে মাতৃভাষার মতো ' সহজ। রাশিয়ায় ফিরতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। না ছিল সম্পত্তি, না বাড়ীঘর, না চাকরি। কেন তবে তিনি ফিরতে গেলেন, যখন যে পারছে সে পালাচ্ছে? এর উত্তর, তিনি রুশভাষার কবি। কেবল রুশভাষার না, রুশ কথ্যভাষার। তিনি সারস্বত কথ্যভাষার যাদুকর। তা ছাড়া রুশদেশের জনগণের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ ছিল। তিনি টলস্টয়পন্থী না হলেও টলস্টয়ের প্রভাবে মানুষ হয়েছিলেন। যেখানে জনগণ সেখানে তিনি। তা ছাড়া তিনি ইতিহাসের স্রোতে ওতপ্রোত হতেও ভালোবাসতেন। তিনি রুশদেশের ইতিহাসের জলের মাছ। বিদেশে বাস করলে হবেন ডাঙার মাছ।

লেনিন তখনো বেঁচে। যদিও তিনি হাড়ে হাড়ে রাশিয়ান মুজিক তবু তিনি অন্তরে অন্তরে ইউরোপীয় ইনটেলেকচুয়াল। মার্ক্স্ স্বয়ং যা ছিলেন। বিপ্লব ঘটে গেছে বলে রাশিযার চিন্তাশীলরা ইউরোপের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন এটা তাঁর কাম্য ছিল না। লেনিন দীর্ঘ-কাল পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আত্মগোপন করে মূলস্রোতের মহিমা অনুভব করেছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তিনি চিন্তা করতেন, তর্ক করতেন, লিখতেন। তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা কেউ অস্বীকার

করেনি। স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবেই তিনি স্বেচ্ছায় মার্ক্সপন্থী হয়েছিলেন। সকলেই সেইভাবে মার্ক্সপন্থী হবেন এই ছিল তাঁর আশা ও বিশ্বাস। জোর জুলুম করে কাউকে তিনি ভজাতে চাননি। নিজের দেশের ইনটেলেকচুয়ালদের উপর জোরজুলুম করা অবশ্য সহজ, কিন্তু পৃথিবীর প্রথম শ্রমিককৃষক রাষ্ট্র যদি এরূপ কুদৃষ্টান্ত দেখায় তা হলে পশ্চিম ইউরোপের ইনটেলেকচুয়ালরা তা দেখে বিগড়ে যাবেন। তা হলে বিপ্লব দিকে দিকে ছড়াবে না। একমাত্র রাশিযাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তা যদি হয তবে রাশিযাতেও দৃঢ়মূল হবে না। পশ্চিম ইউরোপেও বিপ্লব ঘটা চাই। তার জন্যে সেসব দেশের ইনটেলেকচুয়ালদের আকর্ষণ করতে পারা চাই। তাদের আকর্ষণ করার সেরা উপায হচ্ছে রুশ লেখকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

সাহিত্যিক ব্যাপারে লেনিনের পরামর্শদাতা ছিলেন গোর্কি। তিনিও লেনিনের মতো পাশ্চাত্য সংসর্গে ও ব্যক্তিস্বাধীনতায আস্থাবান। তাই রুশ লেখকদের রকমারি "ইজ্‌ম" ও গোষ্ঠী বিপ্লবের পূর্বে যেমন ছিল পরেও তেমনি রইল। বিপ্লববিরোধীরা আপনি সরে পড়েন। যাঁরা থাকেন বা ফিরে আসেন তাঁরা সকলে বিপ্লববাদী না হলেও বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল স্বাধীন লেখক। লেনিন ও গোর্কি এঁদের মর্যাদা স্বীকার করতেন। তাই পাস্তেরনাক নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে পেরেছিলেন। লেনিনের মহাপ্রস্থানের পরেও আরো কবিতা লিখেছিলেন, আরো গল্প, গদ্যে আত্মজীবনী, পদ্যে উপন্যাস। যদিও তিনি ভুলেও আর কারো মতো হবেন না তবু তাঁর অনন্যতাও জনপ্রিয় হয়। কিন্তু ক্রমেই দেশের আবহাওযা বদলে যায। প্রথমে আত্মহত্যা করেন এসেনিন ১৯২৫ সালে। তারপরে আত্মহত্যা করেন মায়াকোভস্কি ১৯৩০ সালে। তার পরে আপনা হতে অপসরণ করেন পাস্তেরনাক ১৯৩২ সালে। সেই যে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন সে ব্রত অল্প

*কিছুদিনের জন্যে ভঙ্গ করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেশ যখন আক্রান্ত। তার পরে আবার নীরব হন যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গে "কস্‌মোপলিটানিজম"-*এর উপর কর্তৃপক্ষের ধর্ষণ লক্ষ করে। যুদ্ধকালে যারা মিত্র ছিল যুদ্ধের পরে তারাই হলো শত্রু। সুতরাং তাদের সংস্কৃতিও হলো বর্জনীয়। মাঝখানে খাটিয়ে দেওয়া হলো লৌহ যবনিকা। রাশিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় সম্রাট পিটার প্রমুখ একদল যেমন রাশিয়াকে ইউ-রোপীয় বানানোর পক্ষে ডস্টইয়েভস্কি প্রমুখ আরেক দল তেমনি ইউ-রোপীয় সংস্কৃতির বিপক্ষে। লৌহ যবনিকা তারই রকমফের। পাস্তের-নাক মৌলিক রচনায হাত না দিলেও কলম একেবারে বন্ধ করেননি। অনুবাদ করেছেন অপরের রচনার। জর্জিয়ান বন্ধুদের কবিতা, শেকস্‌-পীয়ার শেলী গ্যেটে প্রভৃতির নাটক ও কাব্য। এইসূত্রে তিনি "কসমোপলিটান" অথবা ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছেন। দেশান্তরে পালিয়ে গিয়ে যেমন ডাঙার মাছ হননি দেশে আটক থেকেও তেমনি কুয়োর ব্যাঙ্‌ হননি। তা বলে তিনি কারো চেয়ে কম রাশিয়ান নন। মূল তাঁর রাশিয়ার মাটিতেই। যদিও সর্বাঙ্গে তাঁর ইউরোপের মূলস্রোত। লেনিনের ও গোর্কির রাশিয়ায এটা নিন্দনীয় ছিল না। হলো স্টালিনের ও জ্‌দানবের রাশিয়ায়।

স্টালিনের দিক থেকেও যথেষ্ট বলবার আছে। লেনিন, ট্রট্‌স্কি প্রভৃতির বিশ্বাস ছিল যে ইউরোপের অপরাপর দেশে বিপ্লব ঘটলেই তার ফলে রুশবিপ্লব দৃঢ়মূল হবে। কিন্তু আট দশ বছর অপেক্ষা করেও দেখা গেল তার সম্ভাবনা নেই। তা হলে রুশবিপ্লব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায কী করে? একা রাশিয়া কত দূর যাবে? চার দিকেই যে শত্রু। ক্রেমলিনে তখন বড় রকম একটা পরিবর্তন হয়। তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। সবাইকে ও সব-কিছুকে মোবিলাইজ করা হয়। জীবনের কোনো বিভাগকে, সমাজের কোনো অংশকে বাদ দেওয়া হয়

না। কাব্যকেও না, কবিকেও না। বিপ্লবকে তো মেনে নিয়েছি, এই বলে নিস্তার পাবেন ভেবেছেন? ভবী ভোলবার নয়। লিখতে যখন জানেন তখন লিখতে হবে কলকারখানা, লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতির উপর। তা আপনার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক। তা আপনি বুঝুন আর নাই বুঝুন। আপনি হয়তো হৃদয়প্রধান কবি কিংবা দর্শনেন্দ্রিয়প্রধান কিংবা শ্রবণেন্দ্রিয়প্রধান। আপনি হয়তো মস্তিষ্কচর্চা করেন না, পাছে আপনার কবিতা নীরস হয়। তা বলে আপনার ওজর আপত্তি শুনব না। আপনাকে মার্ক্সীয় ডায়ালেক্টিক্স আয়ত্ত করতেই হবে। অন্তত কয়েকটা পড়ে পাওয়া বুকনি। আপনাকে মাফ করতে বলছেন? উঁহু। একজনকে মাফ করলে আরেক জনকে মাফ করতে হয়। এক এক করে সবাইকে মাফ করতে হয়। আপনি যিনিই হোন না কেন, যত বড়ই হোন না কেন আপনার ছাড় নেই।

গোর্কি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে অসহায় ও অসুখী। স্টীমরোলার তাঁকেও গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। অন্যে পরে কা কথা। কবিদের গোষ্ঠীগুলি একে একে ভেঙে যায়। রকমারি "ইজ্ম" গিয়ে একটিতে ঠেকে। কমিউনিজ্ম। দল উপদল গিয়ে একটিতে বিলীন হয়। রাশিয়ান প্রোলিটারিয়ান রাইটার্স য়্যাসোসিয়েশন। পরে রাইটার্স ইউনিয়ন। কর্মকর্তাদের নেপথ্যে বড় কর্তা। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। স্টালিন কিন্তু সত্যিই দয়ালু ছিলেন। পাস্তেরনাক যদিও লিখতে ভুলে গেছেন তবু তাঁকে এক ডেলিগেশনে প্রতিনিধি মর্যাদা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো প্যারিসে। অ্যান্টিফাসিস্ট রাইটার্স কংগ্রেসে। মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁইও দেওয়া হলো মস্কোর অদূরে লেখকদের উপনিবেশে। কিন্তু পাস্তেরনাকও আরেক ভবী। ভবী ভোলবার নয়। মার্শল তুখাচভ্স্কি প্রভৃতির প্রাণদণ্ডের সমর্থন করে এক ইশ্তাহার সই করতে যখন পাস্তেরনাককে

বলা হলো তিনি সই করলেন না। সে সময় অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে গোর্কিও বেঁচে নেই যে তাঁকে রক্ষা করবেন। সে বছর আর তার পরের বছর বহু লোককে কোতল করা হয়। তাঁদের মধ্যে লেখকও ছিলেন বড কম না। পাস্তেরনাকের বন্ধুও। বহু লেখক আত্মহত্যা করেন, বিলুপ্ত হয়ে যান।

যেখানে প্রাণে বেঁচে থাকাই দায় সেখানে আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখা আরো কত কঠিন! পাস্তেরনাক প্রাণেও বাঁচলেন, আত্মাকেও বাঁচালেন, আফিনোগেনোভ বলে একজন তরুণ নাট্যকারকে পক্ষপুটে আশ্রয়ও দিলেন। স্টালিন দয়ালু না হলে কি সম্ভব হতো এসব? কিন্তু যাঁর প্রতি দয়ালু তিনি একজন সত্যাগ্রহী। শুধু তাই নয়, তিনি যে কত বড একজন কবি তা ১৯২৯ সালে প্রকাশিত চতুর্দশ সংস্করণ এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা খুললে প্রমাণ হবে। লিখেছেন প্রিন্স মিরৃস্কি—

"Boris Pasternak (b. 1890), unquestionably the greatest living Russian poet (principal book of lyrics, *My Sister, Life*, written 1917, published 1922) is externally connected with some aspects of Futurism, but in substance he is nearer to the traditions of Tyutchev and Fet. His poetry is marked by an absolute freshness of perception and combined with a tensity of lyrical emotion that is to (*sic*) found only in the greatest. His prose (*Tales*, 1925) is also of the highest order, and being concerned with the realities of the soul stands apart from that of his contemporaries." Russian Language and Literature, ***Encyclopaedia Britannica***, 14th Edition, Vol. 19, p. 757)

প্রিন্স মিরৃস্কি যখন এই নিবন্ধ লেখেন মায়াকোভস্কি তখনো জীবিত। মিরৃস্কি তাঁকে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান দেননি। দ্বিতীয় স্থান দিয়েছেন মারিনা ৎস্বেতায়েভা (Marina Tsvetayeva)-কে।

পাস্তেরনাকের এই পোজিশন তাঁর স্বদেশের বিপ্লবী সমালোচক মহল মেনে নেননি। যে কবিতা প্রত্যক্ষভাবে সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধনের কাজে লাগে না, যার ফিউচারিজম শুধুমাত্র সাহিত্যে নিবদ্ধ, তা নিয়ে তাঁরা করবেন কী? সত্যি, সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনের কথা ভেবে পাস্তেরনাক কবিতা লিখতেন না। তাঁর ভাবনা ব্যক্তির জন্যে, সত্যের জন্যে, রূপের জন্যে, রসের জন্যে, উক্তির জন্যে, জীবনের জন্যে, জীবনের তাৎপর্যের জন্যে। তাঁর ইতিহাসবোধ প্রখর। ইতিহাসকে তিনি অবহেলা করতে চান না। কিন্তু কাব্য যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা নিয়ে তিনি করবেন কী? দেশের কর্তাদের সঙ্গে, সমালোচকদের সঙ্গে, সবাক্ সাধারণের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর গুরুতর মতভেদ। বছর খানেক ইন্‌সম্‌নিয়ায় ভুগে তাঁর মানসিক অসুখের পূর্বলক্ষণ দেখা দেয় '৯৩৫ সালে। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে কত লোক যে আত্মহত্যা করেন, কত লোক নিহত বা বিলুপ্ত হন, কত লোক নির্বাসনে যান! প্রতিভাময়ী মহিলাকবি মারিনা ৎস্বেতায়েভা ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ অবধি বিদেশে ছিন্নমূল ছিলেন। দেশের মাটিতে মূল ফিরে পাবার আশায় যেই না ফিরেছেন অমনি বেচারির স্বামীকে ধরে নিয়ে গিয়ে বধ করা হলো পুরাতন প্রতিবিপ্লবী বলে। পুত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে তারও প্রাণবিয়োগ হলো। কন্যাকেও গ্রেপ্তার করে কোথায় চালান দেওয়া হলো। মারিনাকে বলা হলো এক মফঃস্বল শহরে থাকতে, সেখানে তিনি একটা ঝি-গিরিও জোটাতে পারলেন না। অগত্যা উদ্বন্ধনে বিদায় নিলেন দেশের কাছ থেকে ১৯৪১ সালে।

যারা হেরে গেল, হারিয়ে গেল, লোপ হলো, ভেঙে পড়ল, বেঁচে থেকেও মরে রইল তাদের কথা কি কেউ কোনো দিন শুনবে না? কে শোনাবে? কার অত সাহস? কণ্ঠরুদ্ধের কণ্ঠস্বর হবে কে?

পাস্তেরনাক। আর তো কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। তা হলে কি মৌনভঙ্গ করতে হবে? পাস্তেরনাক সময় নিলেন। গোটা চতুর্থ দশকটাই অতীত হলো। "ডাক্তার জিভাগো" শুরু করতে তাঁর ত্বরা ছিল না। তিনি কবি। উপন্যাস তো তাঁর মিডিয়াম নয়।

অথচ শুরু না করে তাঁর শান্তি ছিল না। ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা। বিশ বছর ধরে যা জমেছে তাকে ঢেলে দিতে হবে সাহিত্যের আধারে। সে আধার কাব্য নয়, উপন্যাস। তা হলেই তাঁর বেদনামুক্তি। নইলে নয়। স্টালিন তখনো বেঁচে। আরো কতকাল বাঁচবেন কে জানে! প্রকাশের আশা নেই। তবু লিখতেই হবে। লেখাটাই প্রকাশ। বই লেখার মাঝখানে স্টালিনের মৃত্যু। সাহিত্যে "তুষারদ্রব"। বছর কয়েক পরে তার ফলে নতুন লেখক দুদিন্‌ৎসোভের "কেবল রুটি দিয়ে নয়" বেরিয়ে গেল। পুরোনো লেখক পাস্তেরনাকের "ডাক্তার জিভাগো" বেরোবে না? পাণ্ডুলিপি পাঠানো হলো "নোভি মির" পত্রিকায়। পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সহজ হবে। তখন ১৯৫৬ সাল।

"নোভি মির" পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেন সংশোধনের জন্যে। কয়েকটি জায়গায় তাঁদের আপত্তি ছিল। আপত্তির পক্ষে তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন। পাস্তেরনাককে তাঁরা অশ্রদ্ধা দেখাননি। সরাসরি প্রত্যাখ্যান তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। এর পরেও পাস্তেরনাকের কবিতা তাঁরা প্রকাশ করেন। শত্রুতা থাকলে এটা সম্ভব হতো না। বস্তুত "ডাক্তার জিভাগো" লিখতে গিয়ে লেখক হাতে রেখে বলেননি, রেখে ঢেকে বলেননি, মন রাখা কথা বলেননি। তা যদি করতেন তা হলে তাঁর বেদনামুক্তি ঘটত না, তিনি শান্তি পেতেন না। তাঁর জীবনের সত্য তিনি কত কাল গোপন রাখতেন! বয়স তো হলো গিয়ে ছেষট্টি।

আর কদ্দিন বাঁচবেন যে বুকে চেপে রাখবেন! পাস্তেরনাক বরাবর স্পষ্টবাদী। তার একটা পুরাতন নমুনা দিচ্ছি।

....In time to come, I tell them, we'll be equal
to any living now. If cripples, then
no matter : we shall just have been run over
by 'New Man' in the waggon of his 'Plan.'

And when from death the tablet doesn't save us,
then time will hurry on more freely still
to that far point, where 'Five year plan' the second
prolongs the dissertations of the soul.

Don't kill yourselves, don't grieve. I'll still be with you
that day ; by all my weaknesses I swear.
And the strong men are promised their survival
from the worst plagues that have subdued us here.

(*Second Birth* translated by J.M. Cohen, Pasternak, Prose and Poems, Benn, P. 310)

"ডাক্তার জিভাগো" একটি দুর্বল মানুষকে নিয়ে লেখা। কিন্তু লিখেছেন যিনি তিনি বলবান পুরুষ। কায়ে মনে আত্মায় তিনি মহামারী অতিক্রম করেছেন ; কিছুতেই তাঁকে দুর্বল করতে পারেনি, দমাতে পারেনি। হতাশ করতেও পারেনি। তিক্ত করতেও না।

॥ ২ ॥

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির হঠাৎ পরিবর্তন না হলে, "তুষারদ্রব" বন্ধ না হলে রাশিয়াতেই হয়তো "ডাক্তার জিভাগো" প্রথম দিনের আলো দেখত। পাস্তেরনাক তো আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন, তিনি ইতিমধ্যে ইতালীয় সংস্করণের অনুমতি দিয়ে ফেলেছেন। ইতালীয় প্রকাশক তাঁর অধিকার ছাড়বেন কেন? রুশ কর্তাদের নিষেধ

অগ্রাহ্য করে তিনি ও-বই প্রকাশ করলেন। অমনি ইউরোপে আমেরিকায় এশিয়ায় আফ্রিকায় অস্ট্রেলিয়ায় পাস্তেরনাকের অন্তর উদ্‌ঘাটিত হলো। হলো না কেবল তাঁর নিজের দেশে। টলস্টয়ের বরাতেও এ রকম ঘটেছিল। তাঁর বই জারশাসিত রাশিয়ায় স্বভাষায় প্রকাশ করতে দেওয়া হলো না। প্যারিসে ছাপা হলো ফরাসী ভাষায়। জার কিন্তু তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস পাননি। আরো একবার এ রকম ঘটে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়। পিল্‌নিয়াকের "মেহগ্নি" রাশিয়ায় প্রকাশ করা বারণ হলো। তখন ছাপা হলো বার্লিনে। তাঁকে রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করা হয়। আট বছর পরে ১৯৩৭ সালের "পার্জ"-এ তিনি বিলুপ্ত হন। শোনা যায় তাঁকে গুলী করা হয়।

"ডাক্তার জিভাগো" বিদেশে প্রকাশিত হওয়ায় পাস্তেরনাকের দশা হলো শোচনীয়। দেশের লোক তো বিমুখ হলোই। বিদেশের লোকও এমন ভাবে তাঁকে মাথায় করে নাচতে লাগল যেন তিনি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। তা দেখে তিনি সম্ভবত ভগবানকে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে প্রভু, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।" এই সব অতিপ্রশংসকদের মনোগত অভিপ্রায় পাস্তেরনাকে বড় করা নয়, সোভিয়েট রাশিয়াকে ছোট করা। রুশবিরোধী প্রচারকার্যের হাতল হলো পাস্তেরনাকের নামঞ্জুর উপন্যাস। যেন আর কোনো দেশে আর কোনো পত্রিকার দ্বারা আর কারো উপন্যাসাদি নামঞ্জুর হয়নি। জেমস জয়েসের "ইউলিসিস", ডি. এইচ. লরেন্সের "লেডী চ্যাটার্লিস লাভার" দূরের কথা, মহাত্মা গান্ধীর "হিন্দ্‌ স্বরাজ" ও রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"র ইংরেজী সংস্করণ এককালে নিষিদ্ধ ছিল। শুনলে হাসি পাবে ফর্স্টারের "এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" ভারতে আসতে দেওয়া হতো না গোড়ার দিকে। অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ায় স্বয়ং ডস্টইয়েভ্‌স্কির অধিকাংশ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ ছিল। এই

সম্প্রতি তাঁর বরাত ফিরেছে। শোলোকোভের ১৯২৮ সালে প্রকাশিত "শান্ত বহে ডন" উপন্যাসকেও পরে শোধন করা হয়। পাস্তেরনাকের বই নিয়ে যে কলরব চলল তাতে অদ্ভুত সব অত্যুক্তি ছিল। এ বই নাকি টলস্টয়ের "সমর ও শান্তি"র সমপর্যায়ের ও একই ঐতিহ্যের। কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা পাস্তেরনাককে মনে করা হলো বিপ্লব-বিরোধী। তাই যদি তিনি হতেন তবে বুনিনের মতো, খোদাসেভিচের মতো দেশান্তরী হলেন না কেন? বরং বিপ্লবের দিনেই তাঁর কবিতার হাত খুলে গেছে। বিপ্লব না ঘটলে তাঁর জীবনও একঘেয়ে হতো। তাঁর দৃষ্টিও কি খুলত। তা বলে বিপ্লবী বা বিপ্লববাদী তিনি ছিলেন না। তিনি ব্যক্তিত্ববাদী এবং সেই কারণে আজ্ঞাবহ লেখক হতে নারাজ। বিরোধটা পলিটিকাল নয়। তাঁর দেশের লোকও তাঁকে ভুল বুঝল। ঘরের শত্রু বিভীষণ বলে তাঁর নিন্দাবাদ চলল। তাতেও তাঁর ক্ষতি হতো না। কারণ তিনি চেনা বামুন। কিন্তু যাঁরা এতকাল তাঁকে নোবেল প্রাইজের উপযুক্ত বলে গণ্য করেননি, করেছেন বহু অখ্যাত-নামাকে, তাঁরা অকস্মাৎ তাঁকে স্মরণ করলেন। আগুনে ঘি পড়লে যা হয়। পাস্তেরনাককে তো রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বিতাড়ন করা হলোই। বলা হলো, "যান, যান, প্রাইজ নিন গিয়ে। কিন্তু আর ফিরে আসতে হবে না।" সোভিয়েট ইউনিয়নে।

লেখক পুরস্কারের জন্যে বই লেখে না। লেখে অন্তরের সত্যকে বাইরে আনতে। কেউ যদি বিনা শর্তে পুরস্কার দেয় নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু যে-কালে ও যে-অনুষঙ্গে পাস্তেরনাককে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় সে-কালে ও সে-অনুষঙ্গে প্রাইজ নেওয়ার অর্থ হতো পাস্তেরনাক তাঁর দেশের মুখে কালি মাখিয়েছেন বলেই তাঁকে পৌনে দু'লাখ টাকা বকসিস দেওয়া হলো। শত্রুরা তো অমন কথা বলতই, তথাকথিত মিত্ররাও বলত। কবি পাস্তেরনাকের অসামান্য কীর্তির

খবর তারা রাখে না, রাখলে অনেক আগেই তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেবার কথা তুলত। তা হলে তাতে রাশিয়ারও সম্মান বাড়ত। শুধু পাস্তেরনাকের নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক পাস্তেরনাক আলো ছায়া মিলিয়ে যে আলেখ্য এঁকেছেন তার দরুন তাঁকে রাতারাতি এই যে সম্মান দেওয়া এটা তো সেই ছায়ার জন্যেই যে ছায়া রাশিয়ার মুখে পড়েছে। তাই পাস্তেরনাকের সম্মান রাশিয়ার সম্মান নয়। পাস্তেরনাক পুরস্কৃত হলে রাশিয়া তিরস্কৃত হয়।

পাস্তেরনাক মৌন হতে হতে মুনি হয়ে গেছেন। শোলোকোভের ভাষায় "মুনি কর্কট।" তা ছাড়া পুরস্কার, নামডাক ও প্রকাশ্য আরতিকে পাস্তেরনাক চিরকাল পরিহার করে এসেছেন। তাঁর কবিতার বই যখন তাঁর স্বদেশে বার বার বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে হাতে হাতে ঘুরছে তখন স্টালিন একবার ফতোয়া দেন যে বিপ্লবোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ও রয়েছেন মায়াকোভস্কি। স্টালিনকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে ধন্যবাদ দেন পাস্তেরনাক।— কেন? তাঁর আত্মপ্রসঙ্গ থেকে তুলে দিচ্ছি এর উত্তর।

"...for it protected me from the inflation of my role; this began about the time of the Writers' Congress in the middle 'thirties'. I am satisfied with my life and fond of it. I like it as it is, without any extra gold leaf. Nothing is further from my mind than a life stripped of privacy and anonymity and displayed in the glass glitter of a showcase." (*An Essay in Autobiography*, tr. by Manya Harari, Collins and Harvill, p. 119)

এই প্রবন্ধ লেখা হয় "ডাক্তার জিভাগো" শেষ করে প্রস্তাবিত কাব্যসঙ্কলনের ভূমিকারূপে। তখন কি তিনি জানতেন যে তাঁর উপন্যাস বিদেশে প্রকাশিত হয়ে নোবেল প্রাইজ টেনে আনবে, আর সেই সঙ্গে "অতিরিক্ত সোনার পাত"? ও আপদ প্রত্যাখ্যান করেই

তিনি তাঁর জীবনের প্রাইভেসী ও অজ্ঞাতনামীয়তা রক্ষা করলেন বা করতে চেষ্টা করলেন।

উক্ত প্রবন্ধে "ডাক্তার জিভাগো"র উল্লেখ করে তিনি বলেছেন সারা জীবন ধরে তিনি যত কবিতা লিখেছেন সমস্তই তাঁর এই উপন্যাসটির অভিমুখে পদযাত্রা ও প্রস্তুতি। অনেকে মনে করেন উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং পাস্তেরনাক। সেটা ভুল ধারণা। তাঁর জীবনের তথ্য তিনি যেটুকু খুলে দেখাবার সেটুকু খুলে দেখিয়েছেন উপরোক্ত প্রবন্ধে ও "নিরাপদ অতিক্রমণ" নামে পুরাতন আত্মজীবনীতে। এই উপন্যাসে বিধৃত সত্য তাঁর জীবনের তথ্য নয়, জীবনের সত্য। এও একখানি "জীবন, বোন আমার।" তারই সম্প্রসারিত, সমাপিত, সুপরিণত, সংস্কৃত রূপ।

> "My sister, life's in flood to-day, she's broken
> her waves over us all in the spring rain,
> but people with cheap watchchains go on grumbling
> and, like snakes in the grass, politely sting.
>
> The older folk, of course, have got their reasons,
> but really your reason's quite absurd,
> for in the thunder eyes and lawns are lilac
> and the horizon smells of reseda.
>
> For when it's May, and in the railway carriage
> you read timetables on a local track,
> they are far grander than the holy scriptures
> or coachseats that the dust and storms made black...."
>
> (*My Sister, Life*, tr. J. M. Cohen.
> Pasternak, Prose and Poems, Benn, P. 260)

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্পকাল পরে লেখা কবিতায় বিপ্লবকে প্লাবনকে বিনা কারণেই বরণ করে নেওয়া হয়েছে। ঝড়কে, বিদ্যুৎকে সৌন্দর্যের

সঙ্গে, সৌরভের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রের চেয়ে বড় হয়েছে যাত্রাপথের টাইমটেবল। পাস্তেরনাক প্রচারক নন, কবি। তাঁর লেখনী একই সঙ্গে ছবি আঁকে, গান করে, তাঁর উক্তিগুলি তির্যক ও প্রতীকময়। তাঁর কাব্যরচনার পদ্ধতি নিয়ে তাঁর নিজের মত তুলে দিচ্ছি।

"...my concern has always been for meaning, and my dream that every poem should have content in itself—a new thought or a new image. And that the whole of it with all its individual character should be engraved so deeply into the book that it should speak from it with all the silence and all the colours of its colourless black print...I was concerned neither with myself nor with my readers nor with the theory of art. All I cared about was that one poem should contain the town of Venice, and the other the Brest...railway station." (*An Essay in Autobiography*, ibid, P. 81)

পাস্তেরনাক অতি যত্নে তাঁর স্বধর্ম রক্ষা করে এসেছেন। বিপ্লবে আর দুর্ভিক্ষে আর পরিকল্পিত শিল্পায়নে আর কালেক্টিভাইজেশনে আর মহাযুদ্ধে আর শীতল যুদ্ধে তিনি যেমন প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রেখেছেন, যেমন ইতিহাসের উপর, তেমনি তাঁর স্বধর্মের উপর। দেশান্তরী হবার কথা দুঃখের দিনেও ভাবেননি। পুরস্কার ও ঢক্কানাদের জন্যে দেশত্যাগ করবেন? যাদের তিনি কোনো অবস্থায় ছেড়ে যাননি সেই সব পরাজিত, দুর্বল, অসহায় মানুষকে ছেড়ে যাবেন প্রাইজের লোভে? কত লোক নৈতিক বল পাচ্ছে তাঁর নৈতিক বল থেকে। তাদের তিনি পথে বসিয়ে যাবেন? পাস্তেরনাক তা পারেন না। তাই নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করতে হলো। অভদ্রতা? না। ত্যাগ। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ত্যাগ।

পাস্তেরনাকের জীবন ত্যাগে ত্যাগে জর্জর। সঙ্গীত ত্যাগ, দর্শন-শাস্ত্র ত্যাগ, মনের মতো জীবিকা ত্যাগ তাঁর প্রথম যৌবনেই ঘটে। কবিতাকে বরণ করে নেবার পর যখন মায়াকোভস্কির সঙ্গে আলাপ হয় তার বছর খানেক পরে তাঁর মনে হলো তাঁর কবিপ্রতিভা নেই, যেমন মায়াকোভস্কির আছে। তখন সাহিত্য ত্যাগের কথাও তিনি ভাবেন। কিছু একটা ছাড়তেই হবে, না ছেড়ে পরিত্রাণ নেই, তাঁকে পেয়ে বসে এই নেশায়। শেষে তিনি স্থির করেন রোমান্টিক ধারা ত্যাগ করবেন। "নিরাপদ অতিক্রমণ" নামে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে লেখা আত্মজীবনী থেকে নিচেরটুকু উদ্ধৃত হলো।

"But a whole conception of life lay concealed under the Romantic manner which I was to deny myself from henceforth. This was the conception of life as the life of the poet. It had come down to us from the Symbolists and had been adapted by them from the Romantics, principally the Germans. This conception had influenced Blok but only during a short period. It was incapable of satisfying him in the form in which it came naturally to him. He could either heighten it or abandon it altogether. He abandoned the conception. Mayakovsky and Esenin heightened it. In the poet who imagines himself the measure of life and pays for this with his life, the Romantic conception manifests itself brilliantly and irrefutably in his symbolism, that is in everything which touches upon Orphism and Christianity imaginatively. In this sense something inscrutable was incarnate both in the life of Mayakovsky and in the fate of Esenin, which defies all epithets, demanding self-destruction and passing into myth......When "My Sister, Life" appeared, and was found to contain expressions not in the least contemporary

as regards poetry, which were revealed to me during the summer of the Revolution, I became entirely indifferent as to the identity of the power which had brought the book into being because it was immeasurably greater than myself and than the poetical conceptions surrounding me." (*Safe Conduct*, tr. by Beatrice Scott, Pasternak, Prose & Poems, Benn, p. 110)

এখন মনে হয় পাস্তেরনাক মায়াকোভস্কি ও এসেনিনের অনুসৃত পন্থা ত্যাগ করেছিলেন বলেই তাঁর নিয়তি অন্যরূপ হলো। ত্যাগ যাকে বলা হয় সেও একপ্রকার মনোনয়ন। আপন নিয়তি মনোনয়ন। পাস্তেরনাক ত্যাগ করতে করতেই তাঁর নিয়তি মনোনয়ন করে নিয়েছেন। নোবেল পুরস্কার ত্যাগও এই রকম এক নিয়তি মনোনয়ন।

অসাধারণ ত্যাগ ও বিজ্ঞতা ভিন্ন কেউ ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে নিরাপদ অতিক্রমণ করতে পারে না। কোনো মতে প্রাণে বাঁচার জন্যে অবশ্য অত বড় প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। আপোস করলে, হুকুম মেনে চললে, পাখীর মতো পড়লে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয় না। কিন্তু আত্মা বাঁচে না। পাস্তেরনাকের মধ্যে রাশিয়ার আত্মা বেঁচে আছে।

বিপ্লবের পর থেকে এই কথাই আমার মনে হয়েছে যে সমগ্র রাশিয়ায় একটিমাত্র সুর আছে, সে সুর শতকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, সে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সুর নেই। টলস্টয়ের নদী মরুপথে ধারা হারিয়েছে। যেমন সে দেশের জীবনে তেমনি সে দেশের সাহিত্যে। পাস্তেরনাকের রচনা আমার সে ভুল ভেঙে দিয়েছে। তিনি যে ঠিক টলস্টয়-ঐতিহ্যের অনুবর্তী এমন কথা বলব না। কবি পাস্তেরনাকের উপর টলস্টয়ের প্রভাব পড়ার কথা নয়। মিরস্কি লক্ষ করেছেন ত্যুচভ ও ফেৎ নামক ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই পূর্ববর্তীর প্রভাব, অন্যেরা করেছেন রিল্‌কের। দুই যথার্থ। টলস্টয়ের প্রভাব পড়ে থাকতে পারে কবির উপরে নয়, কাহিনীকারের উপরে হয়তো, মানুষের উপরে নিশ্চয়। মানুষ পাস্তের-

নাক মানুষ টলস্টয়ের ধারাবাহী। সত্যনির্ণয়ের জন্যে, সত্যকথনের জন্যে, সত্য করে বাঁচার জন্যে, সত্যের দ্বারা বাঁচার জন্যে তাঁর মধ্যে ছিল টলস্টয়ের মতো ব্যাকুলতা। তাই তিনি কোনো ত্যাগকেই অত্যধিক মনে করেননি। সেই যে মৌনব্রত সেও কত বড় একটা ত্যাগ! কী বেদনাদায়ক!

পদ্মকান্ত ত্রিপাঠীকে পাস্তেরনাক বলেন, "তুমি হয়তো জান না যে, ৩৩ সনেও আমার কবিতা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। রুশভাষার প্রফেসাররা আমাকে মহান কবি ভেবে বসেছিলেন এবং আমার এক একটি কবিতার চার চারটি মানে তাঁরা করতেন। কিন্তু অকস্মাৎ এই প্রফেসাররা ঘোষণা করলেন যে, আমি জনগণ থেকে দূরে সরে গেছি, আমি অহংবাদী, আমি 'সিম্বলিস্ট'। বুর্জয়া সংস্কৃতির প্রভাব এখনও নাকি আমার ভিতরে বিদ্যমান। একটি কাগজ লিখল, আমি এমন কবিতা লিখি, যা শুধুমাত্র আমিই বুঝতে পারি। এবং তারপর…"

"তার পর!"

"এবং তার পর আমি আর কবি থাকলাম না। শুধু এটুকু নয়, আমি কখনও কবি ছিলামই না।" (I no more remained a poet, not only that, I never existed as a poet.)

"তার পর আপনি কী করলেন?"

"কিছুই করলাম না। লেখা ছেড়ে দিলাম। তার পর আমি লেখকই থাকলাম না। লেখক সঙ্ঘ (রাইটার্স ইউনিয়ন) আমাকে একটা খুব বড় কাজের দায়িত্ব দিলেন। বাকুর তৈল মজদুর সম্বন্ধে কিছু লেখার। এই কাজ করতে পারলাম না কেন? কারণ, আমি বাকুর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, মজদুরের সম্বন্ধেও জানতাম, কিন্তু লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বললাম আমি লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। লেখকসঙ্ঘ কৃপাপূর্বক এটা মেনে নেয় এবং আমাকে পচা

ডিমের মতো একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মহান স্টালিন দয়ালু ছিলেন। তিনি আমাকে জেলে পাঠেননি।”...

পাস্তেরনাক আবার যেন বিগত স্মৃতিতে ফিরে গেলেন। অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন। আমি নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। অকস্মাৎ নিজেই বলে উঠলেন, “পঁচিশ বছর ধরে না লেখার অর্থ বোঝ? কখনও কখনও মনে হয আমি একজন ফুটবল খেলোযাড। কিন্তু আমার ডান পা'র একটা নাডি ছিঁডে গেছে। ‘কিক’ মারার জন্যে পা আর ওঠে না। পঁচিশ বছর ধরে আমি অন্যান্যদের খেলা দেখে আসছি। যে ছোট ছোট বাচ্চারা পা ওঠাতে জানত না, তারা নামকরা খেলোয়াড হযে উঠল। যশ, অর্থ, রাজ্যাশ্রয—সবই ছিল ওদের কাছে। তারপর আমার পা-ও ঠিক হযে উঠল, কিন্তু মাঠে আর নামতে পারলাম না।”

“কেন?”

“কারণ তখন খেলার নিযমকানুন বদলে গেছে। এবং ওই নিয়মগুলো থাকতে আমি খেলোযাড় থাকা পছন্দ করলাম না। যশ, অর্থ, গৌরব কিছুই পাব না জেনেও।”

(পাস্তেরনাকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পদ্মকান্ত ত্রিপাঠী, ‘দেশ’ ২৮ নভেম্বর ১৯৫৯)

কী করুণ! অথচ কী বীরত্বব্যঞ্জক! পাস্তেরনাক আত্মিক বলে বলীয়ান ছিলেন। নইলে খেলা ছেড়ে থাকতে পারতেন না। যে কোনো শর্তে খেলতেন। অন্তত লুকিযে লিখতেন। তাও তিনি করবেন না। যখন বলেছেন যে তিনি লিখতে ভুলে গেছেন, লেখার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন, তখন তাঁকে মৌলিক রচনায সত্য করে ক্ষান্তি দিতেই হবে। নইলে কথা উঠবে যে তিনি লিখতে জেনেও লিখছেন না, রাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করছেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে ক্ষমতা

থাকতে আদেশ অমান্য করবে! সুতরাং সত্যের খাতিরে তাঁকে অক্ষম হতে হলো। অক্ষম সাজতে নয়, সত্যি সত্যি অক্ষম হতে।

কিন্তু এই তাঁর জীবনের মহত্তম ত্যাগ নয়। আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ নেই, তবু আমার মনে হয় এর চাইতেও মহৎ এর চাইতেও করুণ ত্যাগ ১৯২৩ সালে ঘটে। যখন তিনি বার্লিন থেকে মস্কো ফিরে আসেন। আত্মীয়স্বজন তো ফিরলেন না, ফিরবেনও না। বিপ্লবকে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের কাছে ওটা নিতান্তই একটা উৎপাত। পাস্তেরনাকের কাছে ওটা একটা নৈসর্গিক ঘটনা। আপনার লোকের সঙ্গে এই যে বিচ্ছেদ, এই যে বিচ্ছেদজাত নিঃসঙ্গতা, রাশিয়ায় ফিরে এর ক্ষতিপূরণ কি কোনো দিন হয়েছে? আমার ধারণা এই বিচ্ছেদই সাত আট বছর পরে বিবাহবিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। মস্কো শহরে তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর ও তাঁর মাথা রাখবার জায়গা থাকে না। অতিথি হতে হয় জর্জিয়ার রাজধানী তিফলিস শহরে গিয়ে য়াশভিলি নামক কবি-বন্ধুর। ইনি আত্মহত্যা করেন ১৯৩৭ সালে।

এই যে পারিবারিক বিচ্ছেদ জিভাগো এ যাতনা সইতে পারেনি। পরাজিত হয়েছে। পাস্তেরনাক সয়েছেন, তাই অপরাজিত রয়েছেন। "ডাক্তার জিভাগো" ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, সব দেশে সব কালে ঝড়ঝঞ্ঝায় যে পাখীর বাসা ভেঙে যায়, প্লাবনে যে পাখীর আশ্রয়তরু ভেসে যায়, সেই পাখীর ট্র্যাজেডী। সমস্তটাই সত্য। প্লাবনও সত্য, তরুও সত্য, পাখীও সত্য, সর্বনাশও সত্য। টলস্টয় ছিলেন সৈনিক তথা দ্রষ্টা। যুদ্ধ করেছেন এবং দেখেছেন। পাস্তেরনাক বিপ্লবী নন। বিপ্লবের সাক্ষী আর ভুক্তভোগী।

কিন্তু ঝড় যত বড় সত্য হোক না কেন সে চিরকাল থাকে না। সে যখন চলে যায় তখন কী হয় তা নিয়ে পাস্তেরনাক তাঁর মৌনভঙ্গের পর একটি কবিতা লিখেছেন। সেটি রুশভাষায় অপ্রকাশিত। রুশবংশীয়

আমেরিকান অধ্যাপক ইউজিন কেডেন স্বয়ং পাস্তেরনাকের কাছ থেকে সেটি উপহার পেয়ে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। পুরোটাই উদ্ধার করছি।

"The air is heavy with the passing storm.
The earth lies calm and free and glad again.
Through all its pores the flowering lilac bush
Drinks deep the pure cool freshness of the plain.

The world's reborn, transfigured by the storm.
The gutters shed a flood of rain. Now fair
And vast the blue beyond the shrouded sky,
And bright the ranges of celestial air.

But more exalted far the poet of power,
Who washes clean the dust and grime away,
When by his art emerge transformed the harsh
Realities and truths of naked day.

Then memories of decades with the storm
Retreat. Free from the past of tutelage,
Our century demands' the time has come
To clear a passage for the coming age.

No swift upheaval swelling of itself
Can make the way for our new life to be ;
Our hope—the message of a spirit kindled
By truth revealed and magnanimity."

(tr. Eugene M. Kayden, ***New Statesman***,
27 December 1958)

পাস্তেরনাক পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে এই প্রত্যয় আপনার ভিতর থেকে পেয়েছেন যে মৃত্যু যেমন সত্য রেসারেকশনও তেমনি।

সেই অর্থে তিনি খ্রীস্টপন্থী। মৃত্যু আর রেসারেকশনের যে নিত্য লীলা চলেছে বিশ্বের বিশাল রঙ্গমঞ্চে তাকেই তিনি প্রত্যক্ষ করে গেলেন ইতিহাসের প্রেক্ষাগারে। তার সব দুঃখ সব শোক গলে গিয়ে মিশে গেছে এই একটি রসে। "অন্ধ যখন দৃষ্টি পাবে" নামে কী যেন এক নাটক লিখছিলেন। শেষ করে যেতে পেরেছেন কি না জানিনে। কিন্তু পাবে। পাবে। অন্ধ একদিন দৃষ্টি পাবে। সেদিন আপনি দেখবে, আপনি বুঝবে। আর স্মরণ করবে চক্ষুষ্মানকে। কবরে রেখে আসবে একগুচ্ছ লাইলাক। পাস্তেরনাকেরও রেসারেকশন হবে। তাঁর অন্য একটি কবিতার এই কয় ছত্র তাঁর এপিটাফ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

> "So that he'd master well his life in bondage,
> In famine, in defeat, without a fault,
> And thus abide a model through the ages,
> A man in sturdiness as plain as salt."
>
> (tr. Eugene M. Kayden, *New Statesman*
> 27 December 1958)

(১৯৬০)

ড্রাগনের দাঁত

অসমে যা ঘটে গেল তা ভারতে প্রথম হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে অভূতপূর্ব নয়। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় সর্বত্র ধর্ম নিয়ে হানাহানি বাধে। সেই একই খ্রীস্ট-ধর্মের দুই শাখা নিয়ে দ্বৈরথ। ইউরোপের লোক অষ্টাদশ শতাব্দীতে

তার উর্ধ্বে ওঠে। তার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হলো ভাষা নিয়ে কাটাকাটি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেসব দেশ স্বাধীন হয়—যেমন পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া, বলটিক রাজ্যগুলি—সেসব দেশে সমস্তক্ষণ আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব লেগে থাকে ভাষার প্রশ্ন নিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেটা এখন ধামাচাপা পড়েছে, সমস্যার সমাধান মিলেছে বলে নয়, কমিউনিজমের পক্ষে ও বিপক্ষে জোটবন্দী হওয়া আরো জরুরি বলে। রাশিয়া ও আমেরিকা যদি সরে যায় তা হলে আবার ওইসব দেশের অমীমাংসিত সমস্যাটা ধামার ভিতর থেকে বেরোবে।

সেই দুটি শক্তি—ধর্ম ও ভাষা—ভারতবর্ষের ইতিহাসেও সক্রিয়। আমাদের ছেলেবেলা থেকে আমরা ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা দেখে আসছিলুম। তার চূড়ান্ত দেখলুম ইংরেজ বিদায়ের আগে ও পরে প্রায় পাঁচ বছর ধরে। এখনো তার জের ভালো করে মেটেনি। কাশ্মীর নিয়ে যদি যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে তবে যুদ্ধও যে বাদ পড়বে তাই বা কেমন করে বলি ? এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে ভারতখণ্ডে ও পাকিস্তানখণ্ডে ধর্মের নামে যুদ্ধ আগের মতো উন্মত্ততা জাগাতে পারবে না।

কিন্তু ভাষার নামে যুদ্ধ ? আসমের ব্যাপার দেখে আশঙ্কা হয় সবে কলির সন্ধ্যা। আমরা যদি এর মূলে না যাই, যদি গোড়া ঘেঁষে সমাধান না করি, তবে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে এর অনুরূপ ঘটতে পারে। যথেষ্ট বিদ্বেষ তলে তলে জমছে। একুশ বছর আগে আমি বম্বে ও মাদ্রাজ বেড়াতে গিয়ে মরাঠা-গুজরাতী ও তামিল-তেলুগুর পারস্পরিক বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করে আসি। কোথায় লাগে তার কাছে হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষ! গান্ধীজীর ও গুজরাতীদের বিরুদ্ধে আমার মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বন্ধু এমন বিষ উদ্গীর্ণ করেন যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক গান্ধীহত্যা। বলা বাহুল্য ভাষার পিছনে

রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ কাজ করে। যেমন ধর্মের পিছনে। একদল মুসলমান যেমন আবার সেই মোগল সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছিল তেমন একদল মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরও অন্তরের সংকল্প ছিল আবার সেই মরাঠা সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনা।

ভাষার লড়াইয়ের প্রথম অধ্যায়টা এই তেরো বছরে মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে। তেলুগুরা পেয়েছে তেলুগুভাষী অন্ধ্র প্রদেশ। তামিলরা পেয়েছে তামিলভাষী মাদ্রাজ রাজ্য। কন্নাডরা পেয়েছে কন্নাডভাষী মৈশুর রাজ্য। মালয়ালিরা পেয়েছে মালয়ালমভাষী কেরল। মরাঠারা পেয়েছে মরাঠীভাষী মহারাষ্ট্র। গুজরাতীরা পেয়েছে গুজরাতীভাষী গুজরাত। ওড়িয়ারা আরো আগে ওড়িয়াভাষী ওড়িশা পেয়েছিল। তারও আগে বাঙালীরা পেয়েছিল বাংলাভাষী অবিভক্ত বঙ্গ। এখন পঞ্জাবীভাষী প্রদেশের জন্যে আন্দোলন চলেছে। সব পঞ্জাবীভাষীর ধর্ম এক হলে এদের দাবী এতদিনে মিটে যেত। মিটছে না তার কারণ পঞ্জাবীভাষী হিন্দুরা মাতৃভাষার চেয়ে পিতৃধর্মকেই আপনার মনে করে। তার জন্যে তারা হিন্দীকেই তাদের মাতৃভাষা বলে ঘোষণা করে। যদিও বাড়ীতে কথা বলে পঞ্জাবীতেই।

অসমের ব্যাপারটার বিচার করতে হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে। সবাই যদি যে যার ভাষার ভিত্তিতে এক একটা রাজ্য আদায় করে নেয় ও সে রাজ্যে নিজের ভাষাকেই করে সরকারী ভাষা তা হলে অসমের অসমীয়ারাই কি একমাত্র ব্যতিক্রম হবে? কোনো কোনো বুদ্ধিমান বলেন অসম রাজ্যের নামটা যদি অসম না হয়ে পূর্বোত্তর প্রদেশ হতো তা হলে অসমীয়াদের দাবী যুক্তিতে টিকত না। বটে! মাদ্রাজ নামটা কি আগে ছিল না? এখনো কি নেই? বম্বে নামটা কি আগে ছিল না? রাখতে কম চেষ্টা করা হয়েছে? পূর্বোত্তর প্রদেশ নাম দিলেও একই ব্যাপার ঘটতে পারত ও আবার ঘটতে

পারে। কথা হচ্ছে ভারতের অন্যান্য ভাষা যদি এক একটি রাজ্যের ভিত্তি হয়ে থাকে, যদি এক একটি রাজ্যের সরকারী ভাষা হয়ে থাকে তা হলে অসমীয়া কি এই প্রোসেসের বাইরে না ভিতরে?

আমি ভারতবিভাগের পূর্বে ভাষাভিত্তিক প্রদেশে বিশ্বাস করতুম। তার পর দেশের ছত্রভঙ্গ অবস্থার ভয়ে সে বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। তার পর একে একে অন্ধ্র, কেরল ইত্যাদি সংগঠিত হতে দেখে হাল ছেড়ে দিই। "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?" আমি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষী দিতে পারি যে জবাহরলাল একে রোধ করতে আপ্রাণ করেছিলেন। নিতান্ত নাচার না হলে তিনি পুরোনো মাদ্রাজ ও বম্বে, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ ভেঙে দিতে রাজী হতেন না। গণতান্ত্রিক নেতা জনমতের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য। জনমত যা চেয়েছে তাই হয়েছে।

একটি পরিবারের বড়, মেজ, সেজ, ন' প্রভৃতি যতগুলি ভাই একটি ছাড়া প্রত্যেকেই যে যার অংশ ষোলো আনা আদায় করে নিয়েছে। বড় (হিন্দী) তো ষোলো আনাতেও সন্তুষ্ট নয়। তাকে দিতে হবে বত্রিশ আনা। বাকী আছে ছোট ভাই। সেই বা কেন তার বখরা না পাবে? অসমীয়াদের দাবীটা আর সকলের দৃষ্টান্ত দেখার ফলে। যারা দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তাদের অগ্রণী হলো বঙ্গ। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সর্বপ্রথম গঠিত হয় ১৯১২ সালে। তার পূর্বের স্বদেশী আন্দোলন যদিও স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন তা হলেও সেইসঙ্গে প্রদেশ পুনর্গঠনের জন্যেও আন্দোলন। সব বাংলাভাষী অঞ্চল না হোক অধিকাংশ বাংলাভাষী জেলা নিয়ে পুনর্গঠিত হয় বঙ্গ। বিহার, ওড়িশা ও অসম চলে যাওয়ার ফলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ বলাই সঙ্গত। ইংরেজের কাছ থেকে বাঙালীই সর্বপ্রথম ভাষাভিত্তিক প্রদেশ আদায় করে নিয়েছে। তার পরে ওড়িয়া ও সিন্ধী। স্বাধীনতার পরে

তেলুগু। এখন তো বাদবাকী সবাই। অসমের থেকে সিলেট চলে যাবার পর অসমীয়ারা যা পাবার তা একরকম পেয়ে গেছে। ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য। নতুনের মধ্যে তারা যা দাবী করছে সেটা হলো সরকারী ভাষার সম্মান। এক্ষেত্রে অগ্রণী হয়েছে তামিলভাষী পুনর্গঠিত মাদ্রাজ। মাদ্রাজ এটা রাতারাতি করত না, করল হিন্দীর সর্বগ্রাসী দাবীর হাত থেকে বাঁচতে। এখন খুব জোর কদমে তামিলীকরণ চলেছে। তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চায় সদ্য ভূমিষ্ঠ মহারাষ্ট্র ও গুজরাত। পশ্চিমবঙ্গ এদের তুলনায় অনেক বেশী সাবধান ও মন্থর। এর জন্যে আমি তাকে শিরোপা দেব। বাঙালীরা চালে ভুল করলে দার্জিলিং হারাবে।

অসম একটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য হবে। সে রাজ্যের সরকারী ভাষা হবে অসমীয়া। অসমীয়ারা মোটামুটি এই চায়। এখন এটা না চায় কে? চায় না সে রাজ্যের বাঙালীরা ও পাহাড়িয়ারা। এদের পক্ষেও যুক্তি আছে। এরা নগণ্য মাইনরিটি নয়। এক একটা জেলায় এরা অবিসংবাদিত মেজরিটি। এমনটি ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। এদিক থেকে অসম একটা ব্যতিক্রম। এদের মাথার উপর এদের বিরুদ্ধতাসত্ত্বে অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দিতে গেলে এরা সহ্য করবে কেন? তার চেয়ে অসম থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক একটা রাজ্য গঠন করবে। যেমন করেছে নাগারা। এখানে মনে রাখতে হবে যে অসমীয়াদের এতে আপত্তি নেই। তারা বরং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নিয়ে সন্তুষ্ট হবে, তবু তাদের মূল দাবী ছাড়বে না। এতটুকু পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আমরা অত বড় পূর্ববঙ্গ বিসর্জন দিলুম কেন? তার কারণ আমরা চেয়েছিলুম অবিসংবাদিত মেজরিটি। গণতন্ত্রের যুগে এর দাম আছে। দাম দিতে হয়েছে ও হচ্ছে। উপায়ান্তর নেই দেখলে অসমীয়ারাও দেবে। আমার তো আশঙ্কা অসমের পার্টিশন অবশ্যম্ভাবী।

দেখছি বাংলা কাগজে লেখালেখি হচ্ছে যে অসমে অসমীয়ারা মেজরিটি নয়, গতবারের আদমস্নুমারিতে নাকি কারচুপি ছিল। এটা কতদূর সত্য আমি জানিনে। যা কিছু লেখা হয় বা বলা হয় তাই সত্য নয়। কিন্তু এসব কথা যারা লেখে বা বলে তাদের জানা উচিত যে এর ফলে অসমীয়ারা আরো উগ্র হতে পারে। দিল্লীতে বসে যদি হিন্দী-ভাষীরা লেখে বা বলে যে বৃহত্তর কলকাতায় হিন্দীভাষীরাই মেজরিটি তা হলে বাঙালীরাও ক্ষেপে গিয়ে মাড়োয়ারীর ভুঁড়ি ফাঁসাতে পারে, বড়বাজারের গদি পোড়াতে পারে, বিহারীদের মেরে ভাগিয়ে দিতে পারে। দেশের সব জায়গাতেই আগুন চাপা রয়েছে। সে আগুন ওই মেজরিটি মাইনরিটি প্রশ্ন নিয়ে। কেউ চায় না মেজরিটি হারাতে। কাজেই মেজরিটিকে "আদমস্নুমারির কারচুপি" বলে উড়িয়ে দিতে যাওয়া মানে ড্রাগনের দাঁত বোনা। সেসব দাঁত থেকে গ্রীক পুরাণের মতো যোদ্ধা জন্মাবে। তখন ভারত খণ্ড খণ্ড হবে।

ড্রাগনের দাঁত দেড়শ' বছর ধরে বপন করা হয়েছে। তারই সমবেত ফল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বর্বরতা। অসমীয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ভারতীয় ভাষা। যেমন স্বতন্ত্র মৈথিলী বা ওড়িয়া। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অতীতে কোনো দিন মুসলিম অধিকারে আসেনি। বাঙালীও সেখানে থাকতে যায়নি গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের আগে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বলতে আমি গোয়ালপাড়া বাদ দিয়ে বলছি। ইংরেজরা ১৮২৬ সালে কাছাড়ের দিক থেকে গিয়ে বর্মীদের হাত থেকে তাদের দ্বারা বেদখল অহোম রাজ্য উদ্ধার করে ও ১৮৩২ সালে পুরাতন অহোম রাজবংশের একজনকে সিংহাসনে বসায়। বছর কয়েক পরে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজরা প্রত্যক্ষ শাসনের দায়িত্ব নেয়। এতকাল অসমীয়া ভাষাই ছিল অহোম রাজ্যের ভাষা ও তার লিপি ছিল স্বতন্ত্র। সে ভাষায় কেবল যে উচ্চাঙ্গের পদ্য লেখা হয়েছিল তা নয়, তার গদ্যও

ছিল উন্নত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নিজের একটা ঐতিহাসিক ধারা ছিল, সে ধারা মুসলিম যুগের বা ব্রিটিশ যুগের ভারতের সঙ্গে মিলত না। অসমীয়া ভাষায় সেই ইতিহাস লেখা হযেছিল। এসবই ১৮৩৬ সালের আগে। ঐ সালে আদালতে ও বিদ্যালয়ে অসমীয়ার বদলে প্রবর্তিত হলো বাংলা। ইংরেজরা এই ড্রাগনের দাঁত বোনে তাদের বাঙালী কর্মচারীদের পরামর্শে। তাদের বোঝানো হয় যে অসমীয়া একটা ভাষা নয়, একটা উপভাষা। বাংলার উপভাষা। ইতিমধ্যে ১৮১৭ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাঁদের বাংলা ছাপাখানায অসমীয়া ভাষায় অনুদিত বাইবেল বাংলা হরফে মুদ্রণ করেছিলেন। তার থেকে প্রমাণ করা শক্ত হলো না যে বাংলা লিপিই অসমীয়া লিপি। কেবল পেটকাটা ব ছাড়া অসমীয়ার আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। অতএব অসমীয়া বাংলার একটি উপভাষা। কয়েকজন বাঙালী কর্মচারী ওড়িশাতেও ইংরেজকে অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্থানীয় বাঙালীরাই এর প্রতিবাদ করে ওড়িযাকে বাঁচান।

আদালত থেকে, বিদ্যালয় থেকে অসমীযা উঠে গেল। বাংলা বসল তার জাযগায়। এও একপ্রকার বিজয। অসমীযারা বিজিত হলো এক ভাবে ইংরেজের হাতে, আরেক ভাবে বাঙালীর হাতে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে আন্দোলন চালায প্রধানত শিবসাগরের আমেরিকান মিশনারীরা। অসমীযা ভাষায় তারা অসংখ্য বই লিখে প্রমাণ করে দেয় যে অসমীযা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। এই আন্দোলনের অসমীয়া পুরোধা ছিলেন আনন্দরাম ফুকন। কলকাতায় হিন্দু কলেজে শিক্ষিত। অবশেষে ১৮৮২ সালে ইংরেজরা ভ্রম সংশোধন করে। অসমীয়া হয় আদালতের ও বিদ্যালয়ের ভাষা অসমীয়া অধ্যুষিত জেলাসমুহে। লিপি কিন্তু বাংলাই রয়ে যায়। সামান্য ইতরবিশেষ বাদ দিলে। অসমীয়াদের ইনফিরিয়রিটি কম্প্লেক্স ও বাঙালীদের সুপিরিয়রিটি কম্প্লেক্স

দীর্ঘকাল থেকে বদ্ধমূল। ওটা গোড়ায় ছিল ভাষাগত, তারপর হলো লিপিগত। আশ্চর্য হব না, যদি বাঙালীর উপর রাগ করে ওরা বাংলা লিপি ত্যাগ করে। দেবনাগরী তো আগ বাড়িয়ে বসে আছে শূন্য স্থান পূর্ণ করতে। অসমীয়ার সঙ্গে বাংলার, তথা বাঙালীর, মস্ত বড এক মিল ছিল এই জায়গায়। বাংলা কাগজওয়ালারা যদি কেবল বর্বরতার নিন্দা করেই ক্ষান্ত হতো তা হলে এই একটি মিল থেকে আরো কয়েকটি মিল বেরোত। কিন্তু নিন্দাটা কখনো জাত তুলে, কখনো মেজরিটি অস্বীকার করে, কখনো বা গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে চলেছে। এর পরিণামে বাঙালী হয়তো নিরাপদ হবে, কিন্তু ভারতের যে প্রান্তটি সব চেয়ে বেশী বাংলা প্রভাবিত সে প্রান্ত থেকে বাংলার প্রভাব মুছে যাবে।

রাজনীতি নিয়ে আমি কোনো কথা বলব না। স্বেচ্ছায় আমি রাজনীতিক প্রবন্ধ লেখা বন্ধ করেছি। তবে আজকাল সব প্রশ্নের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে গেছে। সব প্রশ্নের পশ্চাৎপট রাজনীতি। কিন্তু "অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস" (ইংরেজীতে লেখা) পড়তে পড়তে যে নালিশটা আমি লক্ষ করছি সেটা নিছক রাজনীতিগত নয়। অসমীয়ারা ভাবতে চায়, বলতে চায় যে তারা মরাঠা গুজরাটী বাঙালীদের মতো স্বতন্ত্র একটি জাতি, তাদের ভাষা স্বতন্ত্র একটি ভাষা। কেবল যে তারা স্বতন্ত্র তাই নয়, তারা সমান। এবং তাদের রাজ্যে তারাই বড, যেমন বাঙালীদের রাজ্যে বাঙালীরা। এসব আজকের দিনে অস্বীকার করছে কে? যে করছে সে-ই তাদের শত্রু। এমনি করে একটা জাতিবৈর জন্ম নিচ্ছে। ড্রাগনের দাঁত।

বাঙালীকে বিজ্ঞ হতে হবে। আপনকে পর করে দেওয়া বিজ্ঞতা নয়। যদিও তার বর্বরতা নিন্দনীয়। সেক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে ড্রাগনের দাঁত বোনা হয়েছে ১৮৩৬ সালে। ফসল তো ফলবেই

একদিন না একদিন। ইতিহাসে যা ঘটে তা শত শত বর্ষের কর্মফল। যেমন ১৯৪৬ সালে তেমনি ১৯৬০ সালে। এখন আব একটা ১৯৪৭ না এলেই বাঁচি। অর্থাৎ আর একটা পার্টিশন।

আমি আগেই বলেছি যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীরা কোনো দিন মুসলিম রাজশক্তির অধীনে আসেনি। তার আগেও তারা কখনো মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন হযনি। যতবার পশ্চিম দিক থেকে তাদের জয় করার চেষ্টা হযেছে তত বাব সে চেষ্টা ব্যর্থ হযেছে। গৌডবিজেতা মহম্মদ বিন বখতিযাবকে তাবা হটিযে দিযেছে, মীর জুমলাকেও তাবা ভাগিযে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির আনুগত্য তারা সর্বপ্রথম স্বীকার করল ১৮৩২ সালে। তার আগেও তারা ইংরেজকে ঢুকতে দেযনি। এবাব দিল ইংবেজের চেযেও যে খারাপ সেই মগকে সরাতে। কেন্দ্রীয আনুগত্যের ঐতিহ্য তা হলে মাত্র একশত ত্রিশ বছবের। ইংবেজ অপসরণ কবেছে। এখনকার আনুগত্য স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের প্রতি। এই সরকার যদি একান্ত সতর্ক না হয তা হলে কী ঘটবে তা নাগাভূমির দিকে তাকালেই মালুম হয়। আমরা যখন কথা বলি তখন ধবে নিই যে অসমীযারাও আমাদেরি মতো হিন্দু, সুতবাং আমাদেবি মতো কেন্দ্রানুগ। এটা আমাদের অজ্ঞতা। নেপালের নেপালীরাও তো আমাদেরি মতো হিন্দু।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ কামরূপ কোনোদিন কেন্দ্রানুগ না হলেও মোটামুটি আমাদের সঙ্গেই ছিল। কামরূপ বলতে কোচবিহারকেও বোঝাত। এক সময কোচ রাজধানী ছিল কামরূপের রাজধানী। সে সময় অসমীয়া কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কোচ নৃপতি। কামরূপের আরো পূর্বে শিবসাগর প্রভৃতি অঞ্চলের ঐতিহাস কিন্তু অন্যরূপ। বর্মার উত্তরে যে শান রাজ্য আছে সেইখান থেকে বা আরো দূর থেকে পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়

প্রবেশ করে অহোম জাতি। এরা হিন্দু তো ছিলই না, ছিল ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী। হিন্দুদের উপর রাজত্ব করার পর এদের স্বভাবের পরিবর্তন হয়। এরা বর্বরতা ছাড়ে। সভ্য হয়। একই ভাষায, একই ধর্মে, একই সূত্রে গ্রথিত হয়। অহোমবংশীযদের হিন্দুয়ানীর বয়সও তিন শ' বছরের বেশী নয়। তার আগে এদের সঙ্গে না ধর্মে, না ভাষায়, না রক্তে, না দেশগত আচারে ব্যবহারে. কোনো বিষযেই কামরূপবাসীদের বা আমাদের লেশমাত্র মিল ছিল না। পরে অবশ্য এরা মিলে মিশে এক হযে গেছে। কিন্তু এদের নাড়ীর টানটা ভারতের প্রতি না বর্মার প্রতি তা কে জোর করে বলবে? দেখা তো গেল যে আমাদের স্বজাতীয়দের এক ভাগের নাড়ীর টান মক্কার প্রতি। তারা ঢক্কাকেও মক্কার সঙ্গে বাঁধবে। দিল্লীর সঙ্গে নয। ইতিহাসে কী সম্ভব আর কী সম্ভব নয তা বলবার সাধ্য কোনো মহাপুরুষের নেই। না গান্ধীর, না নেহরুর। সুতরাং সাবধান হওযাই ভালো।

একদা আমরা যা ধরে নিযে তাসের কেল্লা গড়েছিলুম তা ১৯৪৭ সালে ধ্বসে গেল। তাই আর ধরে নিতে পারছিনে যে ভারতীয জাতীয়তাবাদ হিন্দুত্বের বনিযাদের উপর দাঁড়িয়েছে বলে অবিভাজ্য। মূঢ়তা! মূঢ়তা! মূঢ়তা! মূঢ়তা!

অসমের বিভীষিকার একটা ব্যাখ্যা বোধ হয় এই যে সে রাজ্যের কতক লোক উপরে উপরে হিন্দু হলেও তলে তলে বর্মার শান জাতির মতো উগ্র। কিন্তু দেড় হাজার বছর আগেও চৈনিক পরিব্রাজক কামরূপ অধিবাসীদের দেখে নোট করেছিলেন যে তারা করাল। কিন্তু সোজা। আর অধ্যযনশীল। দেশটাই ছিল তান্ত্রিক। তাকে বৈষ্ণব করা আরম্ভ হলো পঞ্চদশ শতাব্দীতে। আমাদের মতো ওদেরও শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ দীর্ঘকাল ধরে গড়ায়। অহোমরা যখন হিন্দু হয় তখন শাক্ত হয। শাক্ত ধর্মই হয় রাজধর্ম। বৈষ্ণবদের ধর্মে কিন্তু

তারা হস্তক্ষেপ করত না। এইভাবে একটা সমঝোতা হয়েছিল। সেটা নষ্ট হয় গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে। রাজেশ্বর সিংহের রানী ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁর রাগ পড়ল বৈষ্ণবদের একভাগের উপরে। বৈষ্ণবপীড়ন করতে গিয়ে রাজ্য হলো ছারখার। শাসনযন্ত্র ভাঙতে ভাঙতে গেল ভেঙে। তখন অহোম সেনাপতি বদন বরফুকন আমন্ত্রণ করলেন বর্মীদের। এমনি করে মগ ঢুকল ১৮১৭ সালে। তার পরে ও তার ফলে ঢুকল ইংরেজ। তার অনুচর সিলেট কাছাড়ের বাঙালী।

ইংরেজের ছোটতরফ হয়ে বাঙালী ভারতের যতগুলি প্রান্তে গেছে প্রত্যেকটিতে সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক চেতনা ও আধুনিকতা বিস্তার করেছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেও কি করেনি? করেছে বইকি। কিন্তু ইতিহাসের যে অমোঘ নিয়ম আধুনিকতার প্রধান প্রবর্তক ইংরেজকে বিদায় করেছে সেই একই নিয়মই ছোটতরফকেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদায় করে দিচ্ছে। বাঙালী যেসব অঞ্চলে ইংরেজের আগে গেছে সেসব অঞ্চলে সে শিকড় পেতেছে, কিন্তু শিকড় যারা পেতেছে তারাও এখন ভুগছে ছোটতরফের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে। ছোটতরফ ইংরেজের চেয়ে ছোট হলেও তাঁর বড়াই কম নয়। কাউকে তিনি বলবেন "উড়ে"। কাউকে "মেড়ো"। "মেড়ো" থেকে "মেড়া" বা ভেড়া। "উড়ে মেড়া" বলতেও আমি শুনেছি। আমারি লেখা সমলোচনা পড়ে এক মহাপ্রভু বলেছিলেন, "ছি ছি! উড়ের হাতে মার!" অথচ আমিই এককালে তাঁর স্বেচ্ছাস্তাবক ছিলুম।

নোয়াখালীর বিভীষিকার সময় আমি জজ ছিলুম ময়মনসিংহে। একই জিনিস সেখানেও ছড়াত। ছড়াত কী, ছড়িয়েছিল কয়েকটি জায়গায়। ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সাহেব দু'জনেই ছিলেন মুসলমান। তাঁরা কিন্তু মুসলমানকে হিংসায় প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, কখনো স্ববেশে কখনো ছদ্মবেশে ঘুরে হিংসাপন্থী মুসলমানদের দমন করেন।

তাঁরা যদি কর্তব্যবিমুখ হতেন, যদি ধর্মান্ধ হতেন, তা হলে নোয়াখালীর বিভীষিকা পূর্ববঙ্গব্যাপী হতো। তাঁরা যা করেছিলেন তার জন্যে তাঁদের নাম আমার স্মরণে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু সেদিনকার পরিস্থিতিটাই ছিল এমন অদ্ভুত যে ভালোর জন্যে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের উপর কারো নজর ছিল না। সবটা নজর কেড়ে নিয়েছিল গুণ্ডারা আর তাদের পলিটিকাল মিতারা। আমিও সমস্তক্ষণ ক্রোধে জ্বলতুম আর মনে মনে প্রার্থনা করতুম সেইদিনটির জন্যে যেদিন ইংরেজ রাজত্বের অবসানে আমরা মুসলিম লীগের পলিটিসিয়ানদের নিয়ে "যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার" আদালত বসাব। উলটো বিচার বিধাতার। আরে বাবা, তারাই কিনা দেশের এক ভাগ কেড়ে নিয়ে রাজা হয়ে বসল। সেই ময়মনসিংহ থেকেই আমাকে অসময়ে বিদায় নিয়ে বাঁচতে হলো। আর আমার সেই দুই মুসলমান সহকর্মী পাকিস্থান হবার আগেই লীগ সরকারের আস্থা হারিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন। তাঁদের দেওয়া হয় অল্প দায়িত্বের কাজ।

তা হলে কি "যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার" হলো না? হলো বইকি। হলো বিধাতার নিজের হাতে। তার পর আয়ুব খাঁর হাতে। তেমনি অসমেও হবে। এসব অপরাধ আপাতত ন্যায়ের কবল এড়াতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের বিচারশালা তো বরাবর খোলা পড়ে থাকবে। শাস্তি একদিন না একদিন একভাবে না একভাবে হবেই। কিন্তু সেটটেই কি বড় কথা? নোয়াখালীর পরে ভালোর জন্যে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁরা না থাকলে কী প্রলঙ্কর ব্যাপারই না হতো! তেমনি অসমেও কি কেউ ভালোর জন্যে কাজ করেনি? আমরা কি সব খবর রাখি? নিশ্চয়ই বহু অসমীয়া আপনাদেরকে বিপন্ন করে বাঙালীকে রক্ষা করেছেন। কোথায় তাঁদের শুভকর্মের স্বীকৃতি বা প্রশংসা! কেবলি তো বর্বরতার কথাই শুনছি। যেন সব অসমীয়াই আসামী। তাঁদের

অসমীয়া না বলে "আসামী" বলা হচ্ছে দুই অর্থে। এই যে এক-চোখোমি এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে অতিরঞ্জন। যেমন নোয়াখালীর বেলা। এতে আপাতত কিছু লাভ হতে পারে, কিন্তু আখেরে লোক-সান। নোয়াখালীটাই আমরা হারালুম। এবার কী হারাচ্ছি কে জানে ? হাঁ, আমাদেরও বিচার আছে। ইতিহাসের বিচারশালায়। কেননা আমরা ভালো দেখতে পাচ্ছিনে আর মন্দকে বাড়িয়ে দেখছি। ক্রোধ কারো মঙ্গল করে না। ক্রোধ থেকে আসে মোহ। যেমন এলো নোয়াখালীর পর। শেষে মোহভঙ্গ। যার নামান্তর ভারতভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ। আমরা সবাই যদি সে সময় শান্ত থাকতুম তা হলে জিন্নার দলের হাত থেকে হাতিয়ার খসে পড়ত। অন্যরকম সমাধান খুঁজে পেতো হিন্দু মুসলমান।

অন্যরকম সমাধান কি আজকের পরিস্থিতিতে নেই ? চিন্তা করতে হবে। তার জন্যেও চাই অক্রোধ। অসমের উপর রেগে টং হয়ে কেন্দ্রের উপর চোখ রাঙানো আর স্বাধীনতা দিবসে কেন্দ্রকে দেখিয়ে দেখিয়ে চোখের জল ঝরানো একই রকমের ছেলেমানুষী। কেন স্বাধীনতা দিবসে আর সব ভারতীয়ের মতো আনন্দ করব না, এর আমি কোনো সন্তোষজনক হেতু আবিষ্কার করতে পারিনি। বলি, তেরো বছর আগে যেদিন হৈ হৈ করে দেশটাকে আর প্রদেশটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো সেদিন কি কারো অন্তরে শোকের দহন ছিল না ? তা সত্ত্বেও তো আনন্দের বান ডেকে গেল। সেটা অতি স্বতঃস্ফূর্ত, অতি স্বাভাবিক আনন্দ। কারণ ইংরেজ সত্যি সত্যি সরে গেল। ইউনিয়ন জ্যাক সত্যি সত্যি নামিয়ে দেওয়া হলো। জাতীয় পতাকা সত্যি সত্যি সরকারী ভবনে উড়ল। তেরো বছর পরে কি আমরা সে আনন্দের কণামাত্র অনুভব করতে অক্ষম ?

কতরকম দুর্যোগের ভিতর দিয়ে ফরাসীরা গেছে। কিন্তু কখনো

শুনিনি যে চোদ্দই জুলাই তারা আনন্দ করতে অস্বীকার করছে। যেহেতু তাদের মন শোকাকুল। মানুষের মন এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে এতে শোকের দিনেও আনন্দের কারণ থাকলে আনন্দ জাগে। সুতরাং শোকসত্ত্বেও স্বাধীনতা উৎসবে সারা ভারতের সঙ্গে হাত মেলানো সম্ভব ছিল, উচিত ছিল। এই যে খারাপ নজির দেখানো হলো এর জন্যে পরে পশ্‌তাতে হবে। বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে অবশিষ্ট ভারত কাল তা চিন্তা করে। এই খারাপ নজিরেরও অনুসরণ করা হবে। তখন জাতীয় সংহতি আর ডিসিপ্লিন বলে কিছু থাকবে না। দেশ তো দুর্বল হলোই, দেশের স্বাধীনতাও কম দামী হয়ে গেল। বিদেশীদের সামনে আমাদের সবলেরই মুখ অসমের দরুন কালো হয়েছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গের শোকাকুলদের জন্যে আরো এক পোঁচ কালো হলো। অসমের অসভ্যতার জন্যে ভারতের সুনামহানির শরিক আর সকলের মতো আমরাও। আবার পশ্চিম-বঙ্গের স্বাধীনতা দিবসের আচরণের জন্যে ভারতের গৌরবহানির শরিক আমাদের মতো আর সকলেও। বিশ্বসভায় ভারতের আসন বোধহয় সামনের সারি থেকে সরে গেল।

ভুল করতে করতেই মানুষ শেখে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়েরই শিক্ষা হবে। কিন্তু তার আগে মন্দ যেন মন্দতর না হয়। হতে হতে আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়। শুধু বাঙালী কেন, সব ভারতীয়কেই ভারতের সর্বত্র বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ। সকলের সর্বত্র যাতায়াতের ও বসবাসের অবাধ ও আইনসম্মত অধিকার মানতে ও মানাতে হবে। এটাও স্বতঃসিদ্ধ। এই মহামারীর ফলে এই দুটি স্বতঃসিদ্ধ যদি সর্ববাদীসম্মত হয় তা হলে নিরীহ নারী ও শিশু ও অসহায় পুরুষের দুর্ভোগ ব্যর্থ যাবে না। যেসব অধিকার কাগজে কলমে আবদ্ধ ছিল সেসব অধিকার কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। কতক

লোক দাম দিল। অধিক লোক ভোগ করবে। ইতিমধ্যেই একটি সুফল লক্ষ করছি। মাদ্রাজে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলে এসেছেন যে হিন্দীকে কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। তা যদি হয় তবে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। যা চাপিয়ে দিতে পারা যায় না তার পিছনে আইনের বল নেই। তা হলে আইনের মূলগ্রন্থে তার স্থান কেন? আমি তো মনে করি হিন্দী বাংলা তামিল তেলুগু অসমীয়া কোনোটাই কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সব ভারতীয় ভাষাই সব ভারতীয়ের ভাষা। তেমনি যে রাজ্যে যতগুলো ভাষা চলে ততগুলো ভাষাই রাজ্যের ভাষা। নিজের সুবিধাটি ষোলো আনা দেখব, প্রতিবেশীর সুবিধা অসুবিধার দিকে ফিরেও তাকাব না, এর নাম জাতীয়তাবাদ নয়। এমন যদি করি তো আমরা এক নেশন নই। বহু নেশন। যদি বহু নেশন হয়ে থাকি তবে এই সত্য একদিন ভারত ভেঙে বলকান করবে।

নাটের গুরু হচ্ছে হিন্দী। হিন্দী যদি তার উচ্চাভিলাষ পরিহার করে তা হলে তার মহান দৃষ্টান্ত সকলে অনুসরণ করবে। হিন্দী ততটুকুই চলবে যতটুকু বিনা বাধায় চলবে। তেমনি বাংলা ততটুকুই চলবে যতটুকু বিনা বাধায় চলবে। তেমনি অসমীয়া ততটুকুই চলবে যতটুকু বিনা বাধায় চলবে। কার কতদূর সীমানা সেটা নির্ধারিত হয়ে যাবে তার নিজের ভোটের জোরে বা লাঠির জোরে নয়। তার প্রতিবেশীর সঙ্গে মিটমাটের দ্বারা। মিটমাটের মনোভাব আসুক, তা হলে অসমের অনর্থ থেকে কল্যাণ উদগত হবে। তা যদি হয় তবে আর রাজ্য ভেঙে তছনছ করতে হবে না। এই প্রোসেসটার দোষ এই যে কেন্দ্র যদি কোনো দিন দুর্বল হয়ে যায় তা হলে রাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসবে। কোথাও একজন বদন বরফুকন তাঁর স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করবেন চীনকে ডেকে। কোথাও একজন মীর জাফর তাঁর স্বাধীনতার

শ্রাদ্ধ করবেন মার্কিনকে আমন্ত্রণ করে। সুতরাং গুরুতর কারণ না থাকলে এর প্রশ্রয় দেওযা চলে না।

এই ব্যাপারে আর একটা জিনিস স্পষ্ট হলো। যেখানে যত বাঙালী আছে সকলের নিরাপত্তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ দায়ী বলে লোকের বিশ্বাস। এর পরে যেখানে যত মাড়োয়ারী আছে সকলের নিরাপত্তার জন্যে রাজস্থান দাযী বলে দাবী করবে। যেখানে যত তামিল আছে সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে চাইবে মাদ্রাজ। এর নাম একস্ট্রা-টেরিটোরিয়াল (extra-territorial) অধিকার ও আনুগত্য। এ এক ভয়ঙ্কর মনোভাব। একে দমন না করলে নির্ঘাত গৃহযুদ্ধ। রাষ্ট্রভঙ্গ। আগেকার দিনে এ মনোভাব ছিল ভারতীয় খেলাফতীদের। এখন দেখছি বাঙালীরও। এর পরে একদিন শুনব কলকাতা শহরে পাঞ্জাবী শিখদের বাস চালাতে দেওয়া হচ্ছে না বলে চণ্ডীগড থেকে কৈফিয়ৎ তলব করা হচ্ছে আমাদের মুখ্য মন্ত্রীর কাছে। সব ক'টা মন্ত্রীমণ্ডল কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের অধীনে বলে আমরা এখনো এ ধরনের সঙ্কটে পড়িনি। কিন্তু এমনও তো একদিন হতে পারে যে এক একটি দল এক একটি রাজ্যের কর্ণধার হবে। তখন কর্ণধারে কর্ণধারে কান ধরাধরি বেধে যেতে কতক্ষণ? সেইজন্যে এখন থেকেই ঠিক করে ফেলতে হবে যে অতি বড় বিভীষিকা ঘটলেও আমরা একস্ট্রা-টেরিটোরিয়াল মনোবৃত্তির পরিচয় দেব না। আমরা দিলে অন্যেরাও দেবে।

বাঙালী যদি অসমে থাকে ভারতের নাগরিকহিসাবে থাকবে, তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার হবে তার শরণ। আর থাকবে অসমের অধিবাসী হিসাবে। তা হলে অসমের সরকার হবে ন্যায়ত তার সংরক্ষক। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আসে কোন্ সূত্রে? আসে সহানুভূতি সূত্রে। কিন্তু সে সহানুভূতিরও একটা ভদ্র সীমা আছে। নইলে অসমের সঙ্গে কেন্দ্রের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধবে। এর কোনোটাই কাম্য নয়।

আমরা বাঙালী হিসাবে অনুরোধ তথা প্রতিবাদ করতে পারি। তার বেশী যদি করতে হয় তা হলে করব ভারতীয় নাগরিক হিসাবে। কিন্তু তা যদি করি তবে এমন কোনো নজির স্থাপন করব না যার ফলে অন্যেরা আমাদের এখানকার ব্যাপারে মাত্রা হারিয়ে হরতাল বা ধর্মঘট করবে। সেও একপ্রকার চাপ দেওয়া। অন্যেরা আমাদের উপর চাপ দিক এটা কি আমদের কাম্য? কোনো কোনো মহাজন বিপ্লবের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। বাঙালী নাকি বিপ্লব করবে এই নিয়ে। মহাজনদের বোধ হয় জানা নেই যে বিপ্লবের উত্তরে প্রতিবিপ্লব বলেও একটা কথা অভিধানে আছে। তার থেকে বাঙালীকে বাঁচাবে কে? কথায় কথায় বিপ্লব করাই যদি নিয়ম হয় তবে মরাঠা ও রাজপুত ও পাঞ্জাবীরাও বিপ্লব করতে জানে। তখন ভারত বাঁচবে কি?

অশুভ চিন্তা, অশুভ বাক্য, এগুলিও এক একটি বীজ। আকাশে এগুলি বুনলে মাটিতে এর ফসল ফলে। সেইজন্যে এসব ড্রাগনের দাঁত বুনতে নেই। যাঁরা বুনছেন তাঁরা হয়তো দেখতে পাবেন না। যারা পরে আসছে সেই হতভাগারাই ফসল কাটবে। তাদের মুখ চেয়ে তাদের পিতামহদের নিবৃত্ত হওয়া উচিত। যে উত্তরাধিকার তাঁরা বাঙালীর ছেলেদের জন্যে রেখে যাচ্ছেন তার তুলনায় অসমের বিভীষিকাও কি নিষ্প্রভ হবে না? তারা কি ধন্যবাদ দেবে?

(১৯৬০)

ঐক্যের সাধনা

ভারতবর্ষের মূলগত ঐক্য মহাভারতের যুগেও ছিল। আজও রয়েছে। হাজার বছর পরেও থাকবে। কিন্তু সেই নিরাকার ঐক্যকে সাকার করতে যখনি চেষ্টা করা হয়েছে তখনি দেখা গেছে নিরাকার ব্রহ্ম তাঁর ঐক্য হারিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর্তি ধরেছেন।

আমাদের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়েই রয়েছে অবন্তী, মগধ, কোশল প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য। প্রত্যেকে স্বাধীন। প্রত্যেকের সৈন্যসামন্ত আছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ নিত্য লেগে আছে। তার সুযোগ নিয়ে ভারত আক্রমণ করছেন মাসিডনের আলেকজাণ্ডার। পাটলিপুত্র থেকে সাম্রাজ্য স্থাপন করছেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। অধিকাংশ রাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হচ্ছে। কয়েক শতাব্দী পরে আবার যে কে সেই। দীর্ঘকাল পরে আবার সাম্রাজ্য রচনা। এবারেও পাটলিপুত্র থেকে। এবারেও আরেকজন চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা। তার পর সে সাম্রাজ্যও ভেঙে খান খান হলো। হর্ষবর্ধন ক্ষণকালের জন্যে ঐক্য বিধান করলেন। তার পর পাঁচ শ' বছর অনৈক্য। দেখা গেল হিন্দুর দ্বারা আর ভারত এক হবে না। রাজনৈতিক ঐক্য কাকে বলে হিন্দু তা ভুলে গেছে।

এবার ঐক্যের নিমিত্ত হলো বহিরাগত মুসলমান। আবার সাম্রাজ্য গড়া হলো। বেশীদিন টিকল না। তার পর উঠল মুঘল সাম্রাজ্য। দীর্ঘ তার পরমায়ু। তার সেই সাফল্যের সঙ্কেত রাজপুতের সঙ্গে মৈত্রী, হিন্দুর সঙ্গে সমান ব্যবহার। আওরংজেব তার সূত্র হারিয়ে ফেলেন। ফলে গোটা দেশটাই চলে গেল ইংরেজের হাতে। ইংরেজ শোষণই করুক আর নির্যাতনই করুক সে যে রকম

ঐক্য দিল আর কেউ সে রকম দেয়নি। দিতে পারেনি। এটা আমাদের নেতারা আগেকার দিনে একবাক্যে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তো শেষ বয়স পর্যন্ত বলে গেছেন ভারতবর্ষ যতদিন না সুদৃঢ়ভাবে এক হয়েছে ততদিন ইংরেজকে রাখতে হবে। তার থাকা দরকার। তবে তাঁর কণ্ঠে অন্য সুর বাজে মৃত্যুর মাস কয়েক আগে। "সভ্যতার সঙ্কট-" এ। তাঁর মহাপ্রয়াণের ছ'টা বছর যেতে না যেতেই ইংরেজও গেল। ঐক্যও গেল। দেশ হয়ে গেল দু'ভাগ।

ভগবানকে ধন্যবাদ। মাত্র দু'ভাগ! গান্ধী, নেহরু, পটেল না থাকলে আরো ক'ভাগ হতো কে জানে! এর একটা ভাগকে "ভারত" আখ্যা দিয়ে আমরা নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে এসেছি যে, এই ভারতই সেই ভারত। এটা একটা ভাণ। যে ভারতে সিন্ধুনদ নেই, তক্ষশিলা নেই, পুরুষপুর নেই, লাহোর নেই, ঢাকা চট্টগ্রাম নেই তাকে ভারত বলাও যা, কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলাও তাই। এই তো আমাদের দশা। এর উপর ভাষা নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা শুরু হয়ে গেছে। এক এক ভাষা তো এক এক রাজ্য। এক এক রাজ্য তো এক এক ভাষা। যতদিন সবাইকে একসূত্রে গাঁথবার মতো দল থাকবে, নেতা থাকবেন, কেন্দ্রীয় শাসন থাকবে ততদিন উপরে উপরে একটা ঐক্য থাকবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমরা যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মগত জীবনের পক্ষপাতী এটা তো প্রত্যেকটি রাজ্যে সুপরিস্ফুট। প্রত্যেকেরই মনের কথা "বাংলা শুধু বাঙালীর জন্যে," "ওড়িশা শুধু ওড়িয়ার জন্যে," "বিহার শুধু বিহারীর জন্যে," "অসম শুধু অসমীয়ার জন্যে," "মাদ্রাজ শুধু তামিলের জন্যে," "মহারাষ্ট্র শুধু মরাঠার জন্যে," "গুজরাত শুধু গুজরাতীর জন্যে," "অন্ধ্র প্রদেশ শুধু তেলুগুর জন্যে।" আর কত নাম করব!

ভগবানকে আবার ধন্যবাদ যে এটা এখন পর্যন্ত মনের কথা। মুখের কথা ভণ্ড সাধুর মতো। কিন্তু যে-কোনো একটা সঙ্কটমুহূর্তে

মুখোস খসে পড়তে পারে। তারই আভাস পাওয়া গেল সম্প্রতি অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ও সেখানকার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে। কত কাঁচা আমাদের ঐক্য তা আমাদের কথায় আর কাজে এমন জাজ্বল্যমান যে এর পরে ঘোরতর আশাবাদীকেও দশ বার ভাবতে হয়। হাল ছেড়ে দেবার মতো অবস্থা এখনো আসেনি, কিন্তু পাল তুলে দিয়ে নৌকো চালিয়ে যাবার মতো নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থাও আর নেই। একদিকে অসমের Scylla, আর অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গের Charybdis। মাঝখান দিয়ে দুর্গম পন্থা।

যেসব ইস্যু নিয়ে ঝগড়া সেসব বিশ্লেষণ করে দেখলে পাই অবিকল ইউরোপের মতো সমস্যা। জার্মান ছিল চেকোস্লোভাকিযায়। কে প্রধান হবে? জার্মান না চেক? উক্রেনিযান ছিল পোল্যাণ্ডে। কে প্রধান হবে? উক্রেনিযান না পোল? এমনি অনেকগুলি দেশে। যারা প্রধান হতে চায না, মাইনরিটি হিসেবে বেঁচে বর্তে থাকতেই চায় তাদের উপরেও মেজরিটির চাপ পড়ে। তারা ত্রাহি ত্রাহি করে। আর্তনাদ শোনা যায়। স্পেনে যে ঐক্য আছে এটা শুধু ফ্রাঙ্কোর অঙ্কুশ তাড়নায়। যেমন পাকিস্তানে আছে আয়ুব খানের চাবুকের মুখে। স্পেন একভাষী দেশ নয, হিস্পানীরা একজাতি নয়। সেদেশে বাস্ক আছে, কাটালান আছে, কাস্টিলিয়ান আছে। রাজতন্ত্র বা কর্তৃতন্ত্র না হলে তাদের একজোট করা কঠিন। গণতন্ত্র ধোপে টেকেনি। পরে টিকবে কি না সন্দেহ। আমাদের এদেশে গণতন্ত্রের বয়স মাত্র তেরো বছর। এখনো বলবার সময আসেনি রাজতন্ত্র বা কর্তৃতন্ত্র বিনা ভারতের ঐক্য স্থায়ী হবে কি না। যদি হয় তবে সেটা অনায়াসে নয়। তার জন্যে বহু লোককে বহুকাল ধরে সাধনা করতে হবে। ঐক্যের সাধনা। যেমন করতে হয়েছিল স্বাধীনতার সাধনা। প্রাণ দিয়ে। জীবন দিয়ে।

ভারত যদি রাজতন্ত্রী বা কর্তৃতন্ত্রী হয় তা হলে গায়ের জোরে তার ঐক্য বজায় রাখা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা হলে আবার উল্টো বিপত্তি। শাসকদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করলে হাতে হাতকড়া পড়বে। ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করা চলবে না। সব কাজে ডিটো দিযে যেতে হবে। এমন কি মহাযুদ্ধে যোগদানের মতো জীবনমরণের ব্যাপারেও। জার্মানীতে, ইটালীতে, জাপানে আমরা ডিকটেটরশিপের পরিণাম দেখেছি। পাকিস্তানে তার পরিণাম দেখার বাকী। আমি ডিকটেটর-শিপের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তা কমিউনিস্ট পার্টির হলেও তার পরিণাম ভয়াবহ। তা হলে কি আমি রাজতন্ত্রের পক্ষে? না। সেও তো হাজার হাজার বছর ধরে দেখা গেল। এক এক করে সব দেশ থেকেই উঠে যাচ্ছে।

ঐ গণতন্ত্রই আমাদের ভরসা। কিন্তু গণতন্ত্র সোজা জিনিস নয়। একদিন সবাই মিলে একটা সংবিধান রচনা করলুম আর অমনি দেশের শাসন নির্বিঘ্নে চলল এমনটি হবার জো নেই। গণতন্ত্র যে ক'টি দেশে সফল হয়েছে সে ক'টি দেশে অর্থাৎ ইংরেজীভাষী দেশগুলিতে গণতন্ত্রের শিকড় অনেক দূর নেমে গেছে। বাইরে থেকে দেখা যায় না কত গভীর তার মূল। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের শিকড় এত শক্ত নয়। আমাদের বিশ্বাসে, আমাদের চিন্তায়, আমাদের অভিজ্ঞতায়, আমাদের আচরণে কোথাও তার সমর্থন নেই। শিক্ষিতদেরই অবস্থা এই। অশিক্ষিতদের অবস্থা অনুমেয়। গণতন্ত্র লোপ পেলে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে লড়বে এমন লোক যেমন পাকিস্তানে নেই তেমনি ভারতেও নেই। থাকলে তাদের সংখ্যা কম।

এখন গণতন্ত্রের অর্থই হলো অধিকসংখ্যকের মত অনুসারে শাসন। সেই অধিকসংখ্যক ভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু ভ্রম করতে করতেই তারা শিখবে। যদি কিছুতেই তারা না শেখে তবে গণতন্ত্র আপনি উঠে

যাবে। কিংবা কেউ একজন এসে তাকে উঠিয়ে দেবে। কিন্তু ভ্রম-সংশোধনেরর আশা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাকে সুযোগের পর সুযোগ দিতে হবে। নইলে তার শিক্ষা হবে না। হবে যা সেটার নাম শিক্ষা নয়, শাস্তি। আমাদের সঙ্কট আসলে গণতন্ত্রের সঙ্কট। এমন এক রাজ্যে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হযেছে যেখানে অধিকাংশ লোকের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা নেই। তাদের নেতা বলতে যে ক'জন আছেন তাঁরা হয অন্ধ, নয় পঙ্গু, নয় স্বতোবিভক্ত বা স্ববিরোধী। দল বলতে যে ক'টা আছে তারা গণতন্ত্রের ক খ গ জানে না। তার পর অধিকাংশ লোক অধিকাংশ কি না এই গোড়ার কথাটা নিযেও তর্ক। অসমীযারা মেজরিটি না মাইনরিটি, বাঙালীরা মাইনরিটি না মেজরিটি এবিষযেও দ্বন্দ্ব।

যাঁরা মনে করেন মুশকিল আসান হচ্ছে রাষ্ট্রপতির শাসন তাঁরা হয়তো ছ'মাসের জন্যে ঠিক। কিন্তু ছ'মাস পরে? ছ'মাস কেন, ছ'বছর পরেও রাষ্ট্রপতির শাসন আবশ্যক হবে। মাইনরিটি চাইবে মেজরিটি হতে। মেজরিটি চাইবে মেজরিটি রাখতে ও খাটাতে। পশ্চিম দিক থেকে এক শ' জন বাস্তুহারা যদি অসমে বসবাস করতে যায় অমনি রব উঠবে, "অসমীযাদের মেজরিটি বিপন্ন।" আবার সেই "ইসলাম ইন ডেন্‌জার।" রাষ্ট্রপতি তো শাসন করবেন। কিন্তু তাঁর পলিসিটা কী হবে? মেজরিটির মত মেনে চলা, না মাইনরিটির মন যুগিয়ে চলা? অসমীয়াদের খুশি করা, না বাঙালীদের খুশি করা? দুই রানীকে সন্তুষ্ট করার কোনো কৌশল কারো জানা আছে কি? জানা থাকলে ইংরেজ অত সহজে প্রাসাদ ছাডত না। তাকে যেতে হলো দুযো সুযোর মাঝখানে পড়ে গুলী চালাতে অনিচ্ছুক হয়ে। সে হিন্দুকেও গুলী করে মারবে না, মুসলমানকেও গুলী করে মারবে না। তার চেয়ে দুই রানীকে দুই রাজত্ব দিয়ে প্রাসাদ থেকে সরে যাবে।

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হলে দুয়ো সুয়োর প্রশ্ন উঠবেই।

রাষ্ট্রপতিকে একদিন মানে মানে বিদায় নিতে হবেই। তখন তিনি কার হাতে রাজ্য দিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম করবেন? না রাজ্য দু'ভাগ করে দেবেন? একভাগ দেবেন অসমীয়াদের? অন্যভাগ বাঙালী ও পাহাড়ীদের একত্র করে? বাঙালী ও পাহাডীদের একজোট কতদিন টিকবে? তখন আবার তো রাজ্য ভাগ করতে হবে? এবার পাহাড়ী ও বাঙালীর মধ্যে। ওইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য যে একেবারে নিষ্কণ্টক হবে তা নয়। তাদেরও মাইনরিটি সমস্যা থাকবে। সে মাইনরিটি অবশ্য কোনোদিন মেজরিটি হয়ে উঠবে না। উঠতে চাইবে না। তবু তো মাইনরিটির অধিকার দাবী করবে। ইউরোপেও এই নিয়ে কম অনর্থ বাধেনি। কথায় কথায় ধুয়ো উঠেছে, "মাইনরিটি বিপন্ন।" ইহুদীদের হজম করা কারো সাধ্য ছিল না। তারাও কাউকে সোয়াস্তি দেয়নি। দেশের বাইরে থেকে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে। জার্মানরা শেষে তাদের মূলোচ্ছেদ করেছে। শোনা যায় ষাট লাখ ইহুদী মরেছে। কী ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি!

আজকের এই সঙ্কট ইতিহাসে অভূতপূর্ব নয়। অন্যান্য দেশে এর অনুরূপ দেখা গেছে। কে কেমন ভাবে সমাধান করেছে তারই উপর নির্ভর করেছে সে দেশের বা সে জাতির ভবিষ্যৎ। মধ্য ইউরোপে ও পূর্ব ইউরোপে এর সমাধান হয়নি বা হলে পৈশাচিকভাবে হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় নৃশংসভাবে হচ্ছে। আলজেরিয়ায় রক্তপাতের সীমাও নেই, শেষও নেই। ভারতে কী ভাবে হয় সেটা এখনো একটা জিজ্ঞাসা। আমরা এতদিন হিন্দু মুসলমান নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। স্বপ্নেও ভাবিনি যে হিন্দুও দলবদ্ধ হয়ে হিন্দুর অন্তঃপুরে হানা দিতে পারে। আমি বলি, অসমীয়াদের আত্মসংশোধনের সুযোগ দাও। তারাই লজ্জায় প্রায়শ্চিত্ত করবে।

(১৯৬০)

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

বছর সাত আট আগে একদিন "শ্রীরঙ্গমে" আমরা দুই বন্ধু "সধবার-একাদশী" দেখতে যাই। মণীন্দ্রলাল বসু ও আমি। দেখলুম মঞ্চে যতগুলি মানুষ প্রেক্ষাগারে তার বেশী নয়। আমরা একটু দমে গেলুম। এত কম দর্শক নিয়ে অভিনয় কি জমবে? শিশিরবাবুরা কিন্তু আদৌ দমলেন না। এমন সপ্রতিভভাবে অভিনয় করে গেলেন যেন প্রেক্ষাগার ভর্তি। সেদিক থেকে আমাদের মনে কোনো খেদ রাখতে দিলেন না। আমরা কড়ি দিয়ে দেখতে এসেছি। আমরা যেন না মনে করি যে কড়ির হিসাবে কিছু কম পেলুম।

তখন জানতুম না যে উপরি পাওনাও জুটবে। আমাকে দেখে আমার বাল্যবন্ধু জিতেন মুখুজ্যে চিনতে পারলেন। মাঝখানে ত্রিশ বছর ব্যবধান। আমিও চিনতে পারলুম তাঁকে। জিতেন যে ইতিমধ্যে নাটক লিখে নাম করেছেন এ রকম একটা জনরব আমার কানে এসেছিল। কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। জিতেন বললেন, "শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করবে? চল, তোমাকে নিয়ে যাই। তোমার বন্ধুকেও।"

অভিনয়ের শেষে যখন সবাই বিদায় নিলেন তখন আমরা তিনজনে চললুম শিশির সন্দর্শনে। তিনি তখন তাঁর খাসকামরায় বসে মেক-আপ ম্যানের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। এক বৃদ্ধ মুসলমান তাঁর সাজ-পোশাক খুলে নিচ্ছে। তাঁর রূপান্তর ঘটছে নিমচাঁদ থেকে শিশির-কুমারে। তখনো তিনি নিমচাঁদের ভাবে বিভোর!

সাত আট বছর পরে স্মৃতি থেকে লিখছি। হলফ করে বলতে পারব না যে ভাষাটা শিশিরকুমারের। তবে তাঁর বক্তব্যটা মোটামুটি এইরকমই।

বললেন, "নিমচাঁদের জীবনটা ছিল ফ্রাস্ট্রেশনে ভরা। এত বড় শিক্ষিত এক যুবক। ইংরেজ তাকে দিত কী? কেরানীর চাকরি। এত বড় ইংরেজীনবিশ কি না কেরানী হয়ে সাহেব সেবা করবে! তাই তাকে করতে হলো বিদ্রোহ। কিন্তু বিদ্রোহই বা তখনকার দিনে করে কী করে? তাই তাকে ধরতে হলো মদ। সেই তার বিদ্রোহ। অমন একটা গুণী লোক উৎসন্ন গেল। সেও একরকম বিদ্রোহ। বিদ্রোহী নিমচাঁদকে দেশ একদিন চিনবে। সে মাতাল নয়। সে স্বাধীন। 'সধবার একাদশী' নাটকখানা আউট অফ ডেট হয়ে গেছে বলে দর্শক আসছে না, এ ধারণা ভুল। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখনি বরং এর প্রকৃত সমাদর হবে। এর দিন যায়নি। এর দিন আসছে।"

এর পরে এলো ইংরেজ প্রসঙ্গ। বললেন, "জাতি ছিল বটে ইংরেজ। ওদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া ছিল। সে ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে হেরে না গিয়ে সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। সত্যি ওরা ছিল গ্রেট। বাঙালী কিন্তু গ্রেট নয়। কোনোকালে ছিল না।"

এবার আমি কণ্ঠক্ষেপ করলুম। বললুম, "আমরা তো কেবল বাঙালী নই। আমরা ভারতীয়। ভারতবর্ষও গ্রেট।"

শিশিরবাবু বোধহয় সেদিন আমার সঙ্গে একমত হননি। ওই ইংরেজই সেদিন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। এককালে দেশসুদ্ধ শিক্ষিত লোককে পেয়ে বসেছিল। সবাই চেয়েছিল ইংরেজ হতে, ইংরেজের মতো করে ইংরেজী বলতে ও লিখতে, ইংরেজীর মতো করে বাংলা লিখতে, তার জন্যে সংস্কৃত অভিধান ঘেঁটে শব্দ সংগ্রহ করতে। নিমে দত্ত একটি সিম্বল। দত্ত পদবীটিই একটি সিম্বল। মধুসূদন থেকে সুধীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। হায়, ইংরেজ! তুমি তোমার একলব্যের বুড়ো আঙুল কেটে তাকে বিদ্রোহী করে তুললে। সেও তোমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভারতছাড়া করল। এখন সে স্বাধীন। কিন্তু তার

চোখে তুমিই গ্রেট। বাংলা তো নয়ই, ভারতও গ্রেট নয়। দিল্লীকে সে থোড়াই মানে।

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাই আমরা। সব আমার মনে নেই। রাত হয়ে যাচ্ছিল। শিশিরবাবু না উঠলে অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা—বিশেষত যাঁদের বয়স কম—বাড়ী যেতে পারেন না। আমরা তাঁদের আটকে রাখছি, এ খেয়াল ছিল না। কেউ হয়তো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। তিনি বললেন, "থিয়েটার করতে যারা আসে তারা অসচ্চরিত্র হয় এটা লোকের ভুল ধারণা। যোগেশ চৌধুরী তো সারা জীবন থিয়েটার করে গেলেন। তাঁর মতো আদর্শ চরিত্র ক'জনের! থিয়েটারে যারা কাজ করে তাদের হাতে টাকা কোথায় যে তারা চরিত্রহীন হবে! ও পথে যেতে হলে টাকা খরচ করতে হয়। গণিকারা হলো strictly professional. ওদের একটা কোড আছে। ওরা বিনামুল্যে দেয় না। আমার এই অভিনেতারা তাই সব সচ্চরিত্র। অভিনেত্রীরাও ভালো মেয়ে। থিয়েটার নিয়ে আছে।"

বিদায় নেবার সময় কেবল যে তাঁর সঙ্গে শিষ্টাচার বিনিময় হলো তা নয়, তাঁর ঘরের বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেও। দেখে তো মনে হলো সত্যি ভালো ছেলে, ভালো মেয়ে। এর আগে কখনো পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীদের এত কাছে আসিনি। সন্ধ্যাটা সব দিক থেকে স্মরণীয়।

বন্ধু জিতেন এখন শিশিরকুমার সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন। শিশিরকুমার তাঁর মনের মানুষ। আর আমার মনে রাখবার মতো মানুষ। আশ্চর্য একটি চরিত্র।

(১৯৬০)

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

শান্তিনিকেতনে বাস করতে এসে প্রথমে যেখানে বাসা পাই তার কাছেই ক্ষিতিমোহনবাবুর বাড়ী। দু'বছর ধরে তাঁর কাছাকাছি থেকে ও সকালবেলা তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তাঁর মতো মনীষীকে যতটুকু চেনা যায় ততটুকু চিনেছি। তার পরে আমি বাসাবদল করি। দেখাসাক্ষাৎ কমে আসে। আর তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ার বাইরে বড একটা বেরোতেন না। আর আমি যে সময় আমার কাজ শেষ করে সন্ধ্যাবেলা পায়ে হেঁটে স্বাস্থ্যচর্চা করতে বেরোতুম সে সময় ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর ওখানে থামতে দ্বিধা বোধ করতুম। এমনি করে তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে আসে।

যতবার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি ততবার কিছু না কিছু শিখেছি। তাঁর ঐশ্বর্য থেকে নিয়ে নিজের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছি। কোনো বার মনে হয়নি যে আমার সময় অকারণে গেল। কথা বলতে বলতে কখনো তিনি চলে যেতেন বৈদিক যুগে, কখনো সাধুসন্তদের মধ্যযুগে। বর্তমান যুগ সম্বন্ধেও তিনি সজাগ ছিলেন। ক্রোচে রবীন্দ্রনাথকে কী লিখেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে কী লিখেছিলেন একদিন ক্ষিতিমোহন আমাকে তার মর্ম শুনিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন সাক্ষী ' গুরুদেব তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন।

ক্ষিতিমোহনবাবুর সব চেয়ে আনন্দ ছিল কবীর, দাদু আর রজ্জবের বচনগুলিতে। এগুলি তাঁর জীবনের পাথেয়। তেমনি ঢাকা অঞ্চলের বাউলের গান থেকে আবৃত্তি করতে ভালোবাসতেন। এগুলিও তাঁর জীবনের অঙ্গ। এ ছাড়া যখনি যেটা প্রযোজ্য তখনি সেটা উপনিষদ্ থেকে উদ্ধার করে শোনাতেন। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি! শেষ বয়সে যখন অথর্ব

হয়ে পড়ে থাকতেন, মুখ দিয়ে ক্ষীণ স্বরে কথা বেরোত, তখন তাঁর মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনেছি সংস্কৃত কোনো শ্লোক বা সুভাষিত।

ক্ষিতিমোহনবাবুর ভাষণ ছিল মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ। যেদিন থেকে তাঁর ভাষণ দান রহিত হলো সেদিন থেকে আমারও মন্দিরে যাওয়া অনিয়মিত হলো। আশ্চর্য মনোহারী করে বলার ক্ষমতা ছিল তাঁর। শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। ওদিকে বিদ্যাচর্চাও যতদিন স্বাস্থ্য ছিল ততদিন অবিরাম চলেছিল। রোজ লাইব্রেরীভবনে তাঁর ঘরে গিয়ে সমানে পডাশুনা করতেন। কী শীত কী গ্রীষ্ম কী বর্ষা।

সারা ভারত জুড়ে তাঁর শিষ্য বা ভক্ত বা আলাপী ছিলেন। বডোদায় সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে যেবার যাই সেখানকার এক বিশিষ্ট গুজরাতী ভদ্রলোক আমাকে বলেন শান্তিনিকেতনে ফিরে ক্ষিতিবাবুকে তাঁর নমস্কার জানাতে। গুজরাতে ক্ষিতিবাবু পাযে হেঁটে বহুদিন বেডিযেছিলেন। অন্যান্য প্রান্তও তাঁর জানা ছিল। তাঁর শ্বশুর থাকতেন একসময় কটকে। তিনি লেখাপড়া করেছিলেন কাশীতে। তাঁব মনটা ছিল ভারতীয মন। অথচ সেই সঙ্গে বাঙালীর মন। কথা বার্তায ফুটে বেরোত ঢাকাই বাঙাল।

ক্ষিতিবাবুর রসিকতা এখানে প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের শেষ দিন পযন্ত তিনি হাসিয়ে গেছেন এক একটি রসাল উক্তি করে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ রস। আর কারো সম্বন্ধে এ কথা খাটে কি না জানিনে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সত্যি খাটে। তবে তাঁর রসিকতার প্রকারভেদ ছিল লোক বুঝে। সুধাকান্তদার মতো পুরাতন অন্তরঙ্গদের সঙ্গে তাঁর রসিকতা ছিল সম্পূর্ণ অবাধ।

ক্ষিতিবাবু একবার অন্যের উপরে উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, "আমি বৈদ্যের ছেলে, কাশীতে আয়ুর্বেদ পড়েছি, কলকাতার

মেডিকেল কলেজেও ভর্তি হয়েছিলুম। জাত ব্যবসা করলে আমার রোজগার যা হতো তার তুলনায় আমি কী পেয়েছি? কবিরাজী করে এই বয়সেও আমি এর বেশী পেতে পারতুম। এখানে এসে কি আমার আর্থিক লাভ হয়েছে কিছু?"

বাস্তবিক। তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতনে চলে আসা লাভের জন্যে নয়। সেটা একটা ত্যাগই বটে। লাভ যদি হয়ে থাকে তবে আর্থিক নয়, পারমার্থিক। গুরুদেবের সঙ্গলাভ, তাঁর কাছে জীবনের অমৃত-লাভ, তাঁর কার্যে সহায়তা করে সার্থকতালাভ, দেশবাসীর কাছে সম্মান ও ভক্তিলাভ—ডাক্তারী কবিরাজী করে কি হতো এর মতো প্রাপ্তি? তিনি ঠিকই করেছিলেন। তবু ক্ষণকালের জন্যে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি হয়তো ভুলই করেছিলেন অর্থকরী জীবিকা ত্যাগ করে তখনকার দিনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সপরিবারে দারিদ্র্যবরণ করে।

ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে আমার নিজের একটি কুসংস্কার দূর হয়। আমার ধারণা ছিল আমাদের দেশের যা কিছু প্রগতি, যা কিছু আধুনিকতা, সব ইংরেজী শিক্ষার পরে ও ফলে। কিন্তু ক্ষিতিবাবু আমাকে অনেকগুলি তথ্য দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে ভারতে ব্রাহ্মসমাজের এক শতাব্দী আগেও ব্রাহ্মসমাজেরই মতো সমাজ ছিল, নরনারীর সমান অধিকার ছিল, নিরাকার উপাসনা ছিল, জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল, সামাজিক উদারতা ছিল, অনুদারতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি উদার স্রোতও ভারতের মাটিতে বহমান। সংস্কৃত ভাষার শ্লোক তুলে তিনি এর প্রমাণ দেন। সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষিত হিন্দী সন্তসাহিত্যে নিমগ্ন সেই সাধক নিজেই এর প্রমাণ। তাঁর মধ্যে আমি ভারতবর্ষকে দেখেছি। যে ভারত চির উদার।

(১৯৬০)

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

ছেলেবেলায় "সবুজপত্র" ছিল আমার প্রিয় পাঠ্য। তাতেই সর্বপ্রথম দেখতে পাই ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর নাম। তাঁর প্রবন্ধগুলি ছিল স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা বা রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী এ পরিচয় অবান্তর বা গৌণ। সাহিত্যক্ষেত্রে এর কোনো মূল্য নেই। তাঁর প্রবন্ধে ছিল এমন এক উজ্জ্বল মনীষা ও সহজ লিপিকুশলতার স্বাক্ষর যে তিনি যদি কালেভদ্রে না লিখে নিয়মিতভাবে লিখতেন তা হলে তিনিই হতেন আমাদের অগ্রগণ্য প্রবন্ধলেখিকা।

কিন্তু তাঁর প্রাণ ছিল সঙ্গীতের কোঠায়। সাহিত্যে তিনি ঘটনাচক্রে উপস্থিত হন। "সবুজপত্রে"র সম্পাদকের আসরে লেখনী হাতে। তার আগে তিনি আর কোনো পত্রিকায় লিখেছিলেন কি না আমার জানা নেই। তবে আমাদের ইস্কুলে ছিল কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুরোনো ক্যালেণ্ডার। পাতা ওলটাতে ওলটাতে আবিষ্কার করি ফরাসী সাহিত্যে বি-এ পাস করেছিলেন ইন্দিরা ঠাকুর। গত শতাব্দীতে।

এর বারো তেরো বছর পরে আমি বিলেত থেকে ফিরে শুনতে পাই প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে দেখতে চান। ইতিমধ্যে বেরিয়েছিল "বিচিত্রা" পত্রিকায় আমার "পথে প্রবাসে"। যেদিন চৌধুরী মহাশয়কে প্রথম দর্শন করি সেইদিনই দর্শন পাই তাঁর সহধর্মিণীর। এবং তাঁর শাশুড়ী ঠাকুরানী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর। অপূর্ব পরিবার।

কিছুদিন পরে শান্তিনিকেতনে আবার চৌধুরী দম্পতীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ। ইন্দিরা দেবী আমার জন্যে ছোট একটা আসর ডাকলেন। সেখানে আমি হব প্রধান বক্তা। দেখি জনসংখ্যা তিন কি চার। ইন্দিরা দেবী বললেন, "আচ্ছা, তুমি এ সমস্যার কী সমাধান করবে? এই যে আমাদের মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে। অথচ এদের বিয়ে হচ্ছে না।" আমি বলি, "দিন সব ক'টাকে ঘরছাড়া দেশছাড়া করে। ইউরোপে আমেরিকায়। সাহেব বিয়ে করবে।" তা শুনে তিনি বললেন, "এটা হলো আসুরিক চিকিৎসা।" প্রমথবাবু মুচকি মুচকি হাসছিলেন। তাঁর গৃহিণী কিন্তু গম্ভীর।

মাস দশেক বাদে তাঁরা দু'জনে রাঁচীতে। আমিও সেখানে। আমি কি তখন জানতুম যে একটি বিদেশিনীর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে যাবে? প্রথম সমাচারটা দিতে চললুম আমরা দু'জনে সাইকেলে করে মোরাবাদি পাহাড়ের ধারে তাঁদের দু'জনকে। আমাদের বিস্ময়ের ভাগ তাদের দিতে। চৌধুরী খুশি। চৌধুরানী খুশি নন। বাঙালীর মেয়েদের একেই তো বিয়ে হচ্ছে না, তার উপর একটি সুপাত্রের এই কীর্তি!

বিয়েতে কিন্তু তাঁরা দু'জনেই সানন্দে যোগ দেন। ইন্দিরা দেবীর উপহারে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। আমরা কৃতার্থ হই। এর মাস খানেক পরে গুরুজনের তলব পেয়ে আমার বধূকে ফিরে যেতে হয় আমেরিকা। সে সময় তাঁর সঙ্গে চলে প্রমথ চৌধুরীর "চার ইয়ারী কথা"র ইংরেজী তর্জমা। ইন্দিরা দেবীর অনুবাদ। আমেরিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা যাতে হয়। বইখানা আমার মতে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ক্লাসিক। কিন্তু একই জিনিস যে ইংরেজ মার্কিনদের মন পাবে এমন কোনো কথা নেই। ওরা কেউ ছাপতে রাজী হয় না। তখন বোকার মতো আমি চৌধুরী মহাশয়কে লিখি যে, বইখানা তো ভালোই, কিন্তু অনুবাদটি সেকালের ইংরেজী। তাকে একালের ইংরেজী করতে হলে আর

কাউকে দিয়ে মাজাঘষা করা দরকার। নাম করি আমার বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্যের। প্রমথবাবু তাকে ভালোবাসতেন। আর যায় কোথা! চৌধুরী মহাশয় তো মর্মাহত। তাঁর ধারণা তাঁর সহধর্মিণীর ইংরেজীতে আর কেউ হাত দিতে পারে না। আমিও অপ্রতিভ।

সুর কেটে যায় আমাদের সাদর সম্পর্কের। নানা জায়গায় বদলি হতে হতে আমিও আর দেখা করতে পারিনে। অনেক দিন পরে শান্তিনিকেতনে আবার সাক্ষাৎ। তাঁরা দু'জনে যুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে চলে এসে উত্তরায়ণের অন্তর্গত "পুনশ্চ" নামক গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিমধ্যে "বিশ্বভারতী পত্রিকা"র সম্পাদনার ভার পেয়েছেন চৌধুরী মহাশয়। আমার লেখা চেয়ে চিঠিও লিখেছেন। আবার আমাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। সে সময় লক্ষ করেছি ইন্দিরা দেবী কেমন পতিগতপ্রাণা। তাঁদের দু'জনেরই তখন দুর্দিন। অতি কষ্টে চলে। পুরোনো চাকর ননী কিন্তু তাঁদের ছাড়েনি। সেই পুরাতন ভৃত্য একদিন ছুটি নিয়ে দেশে যায়। আর ফিরে আসে না। মারা যায়। সেদিন তাঁদের কী দুঃখ! আমারও।

ননী ছিল যেমন কাজের তেমনি ভদ্র। আর তেমনি প্রভুবৎসল। একদিন আমাকে আড়ালে বলেছিল, "সাহেব তো আজকাল খালি সোডা খান। এখানে আর কিছু পাওয়া যায় না। আপনি যদি ওখান থেকে—।" আমি তখন সিউড়ির জেলা জজ। সকলে জানে যে আমি গান্ধীভক্ত। মদ আমার বাড়ীতে কোনো আকারেই প্রবেশ পায় না। ওষুধ আকারেও না। ননীর প্রস্তাবে আমি কেমন করে রাজী হই? লোকে ভাববে আমি কিনেছি আমার জন্যে। তা ছাড়া এসব নেশার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। পিউরিটানিজম আমার স্বভাবেও ছিল। পরে ভেবে দেখেছি শেষ বয়সে চৌধুরী মহাশয়কে পানদোষ বিবর্জন না শেখালেই ভালো করতুম।

প্রমথবাবুর মৃত্যুর পরে ইন্দিরা দেবী আবার শান্তিনিকেতনে আসেন। এবার স্থায়ীভাবে। আমিও শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসি। কতবার কত উপলক্ষে দেখা হয়েছে। চৌধুরী মহাশয়ের আত্মজীবনী তিনি নিজের হাতে লিখতে পারেননি, লিখতেনও না যদি ইন্দিরা দেবী না থাকতেন। ইনি তাঁকে দিয়ে বলাতেন আর শুনতে শুনতে লিখে নিতেন। এমনি করে বেশ বড় একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়, কিন্তু কলকাতার দাঙ্গায় তার কতক অংশ নষ্ট হয়। কতক আবার হারিয়ে যায় ডাকে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের কাগজ-পত্র ইন্দিরা দেবী আমার হাতে দেন। আমি দেখি জোড় মেলানো যায় না। আসল জায়গাটিই নেই। যাতে তিনি তাঁর বিলেতের তিন বছরের কথা বলেছেন। তবে তাব থেকে "চার ইয়ারী"র রিনির অংশটুকু বেছে নিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর বার্ষিকীতে প্রকাশ করেছিলেন। আমার হাতে যা আসে আমি তা "পূর্বাশা"য় ছাপিয়ে দিই।

আর একটি মূল্যবান সামগ্রী ইন্দিরা দেবী আমাকে বিশ্বাস করে দিয়েছিলেন। সেটি হলো চিঠিপত্রের বাণ্ডিল। সব ক'টি চিঠি একতরফা। লিখেছিলেন ইংরেজীতে চমৎকার করে জাপানের বিখ্যাত মনীষী ওকাকুরা। যাঁকে লিখেছিলেন তিনি এক বাঙালীর মেয়ে। তাঁর নাম ইন্দিরা দেবী আমাকে বলেননি। শুধু বলেছিলেন অমনি ছাপাতে। আমি একটু ডিটেকটিভগিরি করি। মহিলার নাম প্রিয়ংবদা দেবী। আমার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী। চিঠিগুলিতে যা ছিল তাতে শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমে না। তবু ইন্দিরা দেবীর সঙ্কোচ। প্রিয়ংবদা দেবীর আত্মীয়রা তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। আমি সে নিষেধ মানি। ইংরেজী "বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি"তে মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিই। ওকাকুরা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে আমার গৃহিণীকে দিই। তিনি ভূমিকা লিখে দেন।

ইন্দিরা দেবীর প্রাণ ছিল সঙ্গীত। দেশী বিদেশী উভয়প্রকার সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রিয়। আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন, যতদিন সামর্থ্য ছিল, আমার স্ত্রীর পিআনো বাদন শুনতে। এই তো সেদিন মৃত্যুর দিন কয়েক আগে বললেন, "লীলা, তোমার পিআনো শুনতে এত ইচ্ছে করে। যেতে পারিনে।"

তখন কেই বা জানত যে তিনি এত তাড়াতাড়ি বিনা নোটিশে আমাদের জগৎ থেকে বিদায় নেবেন! বয়স হয়েছিল আশি ছাড়িয়ে আরো সাত বছর। কিন্তু অথর্ব হননি। চুল তেমন পাকেনি। মাথা পরিষ্কার। মৃত্যুর আগের দিনও রিহার্সল নিয়েছেন। তৈরি হচ্ছিলেন রবীন্দ্রসপ্তাহে মহিলা সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ নিতে। কর্তব্যজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। আলস্য কাকে বলে জানতেন না। তাঁর দীর্ঘ জীবনের সীক্রেট কী তা কখনো জিজ্ঞাসা করিনি। অনুমান করলে ভুল হবে না যদি বলি, নিজের কথা না ভেবে সঙ্গীতের কথা ভাবা, সমাজের দশজনের কথা ভাবা।

(১৯৬০)

রামানন্দ স্মরণে

তখন আমি বাঁকুড়ার জেলা জজ। যুদ্ধের হিড়িকে কলকাতা থেকে লোক অপসরণ আরম্ভ হয়ে গেছে। শুনতে পাই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এসেছেন। উঠেছেন তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি যাব করছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখি আমার গাড়ী-বারান্দায় একখানা রিকৃশা এসে থামল। নামলেন স্বয়ং রামানন্দবাবু।

আমরা তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলুম। লজ্জিত হয়ে বললুম, "আপনি কেন কষ্ট করে এলেন? আমাদেরি যাবার কথা ছিল। দু'একদিনের মধ্যে যেতুম। এতদিন যাইনি যে তার জন্যে দুঃখিত।"

তিনি বললেন, "আপনাদের সঙ্কোচের কিছুমাত্র কারণ নেই। যখন সময় পাবেন আসবেন। বাঁকুড়ায় আমি থাকতেই এসেছি। থাকব অনেকদিন।"

তারপর তিনি জানতে চাইলেন আমাদের কাছে ইংলণ্ডের ইতিহাস আছে কি না।

ছিল না। নিরাশ হলেন। একদিন অপেক্ষা করলে হয়তো কলেজ লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করা যেতো, কিন্তু একটা দিনও সবুর করবার উপায় নেই। "মডার্ন রিভিউ"র জন্যে সম্পাদকীয় রচনা নির্দিষ্ট দিনে ডাকে দেওয়া চাইই চাই।

আমার কৌতূহল দেখে বললেন, "পার্নেল সম্বন্ধে যৌবনে যা পড়েছিলুম এখন তা ঠিক মনে নেই। হাতের কাছে রেফারেন্স না থাকলে শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে সম্পাদকীয় লেখা চলে না। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে যুক্তির সঙ্গে প্রমাণ যোগ করতে হবে।"

"পার্নেল? আইরিশ নেতা পার্নেল?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"হাঁ। টাইমস পত্রিকা তাঁর চিঠি বলে জাল চিঠি ছেপেছিল। তা নিয়ে তদন্ত কমিশন বসে। পার্নেল কলঙ্কমুক্ত হন। কমিশন সাব্যস্ত করে চিঠিখানা জাল। সেকালে এই নিয়ে ঢি ঢি পড়ে যায়।" তিনি উত্তর দেন।

আমার এত কথা জানা ছিল না। ইতিহাসের ছাত্র ছিলুম আমিও। কিন্তু আমার পাঠ্যপুস্তকে পার্নেল সম্বন্ধে অত খুঁটিনাটি ছিল না।

যা হোক, আমাদের বাড়ীতে এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা ছিল।

তাতে পার্নেল সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য ছিল। তা পড়ে রামানন্দবাবু বলেন, "চলবে। এখন এটি কি অনুগ্রহ করে আমাকে নিয়ে যেতে দেবেন ? আমি কাল সকালেই ফেরৎ পাঠাব।"

আমার কাছে টাইপরাইটার ছিল। আমার গৃহিণী তৎক্ষণাৎ টাইপ করে দিতে উদ্যত। কিন্তু প্রয়োজনীয় অংশটা ছিল বেশ লম্বা। রামানন্দবাবু অন্যকে খাটাতে রাজী নন। নিজেই খাটবেন। বই নিয়ে রিক্‌শায় ওঠেন। মোটর প্রত্যাখ্যান করেন। আমরা তাঁর তথ্যনিষ্ঠায় অভিভূত হয়ে যাই। শুধুমাত্র রেফারেন্স করায়ত্ত করার জন্যেই তিনি সেদিন অত দূর এসেছিলেন। অত ক্লেশ স্বীকার করে।

বইখানা সত্যি সত্যি তার পরের দিন সকালে ফেরৎ এলো। ভেবেছিলুম তিনি অল্প কয়েক লাইন কাজে লাগিয়েছেন। তা নয়। পরের মাসের "মডার্ন রিভিউ"তে লক্ষ করলুম তিনি দীর্ঘ একটি অংশ এনসাইক্লোপীডিয়া থেকে তুলে দিয়েছেন। তাঁর কাছে তো টাইপ-রাইটার ছিল না। সমস্তটাই তিনি স্বহস্তে লিখে নিয়েছিলেন। কী অসাধারণ ধৈর্য ! নীল পেনসিলের দাগ এখনো আমার এনসাইক্লোপী-ডিয়ায় রয়েছে।

পরে তাঁর সঙ্গে আরো অনেকবার দেখা হয়েছে। প্রধানত তাঁর বাঁকুড়ার বাড়ীতে। ঝড় আসুক, ঝাপটা আসুক, রোগ আসুক, শোক আসুক, রামানন্দবাবুর সম্পাদকীয় রচনা বন্ধ হবার নয়। বিলম্বও হবার নয়। ঠিক নির্দিষ্ট দিনে তাঁর কাগজ বেরোবেই। তার আগে তাঁর সম্পাদকীয় রচনা কলকাতায় পৌঁছবেই। সেই আন্দাজে বাঁকুড়া থেকে ডাকে দেওয়া হবেই। সময়জ্ঞান ছিল তাঁর কর্তব্যজ্ঞানের অঙ্গ। যে সময়ে যে কথাটি প্রাসঙ্গিক সে সময়ে সেটি প্রকাশিত না হলে পরে তার কদর থাকে না। ঐ পার্নেল সম্বন্ধে উদ্ধৃতিটি কেন যে সে সময় প্রাসঙ্গিক ছিল এতদিন পরে আমার খেয়াল নেই। কিন্তু ঠিক সময়ে

ঠিক জিনিসটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে আশ্চর্য দক্ষতা ছিল তাঁর।

পি-ই-এন নামক লেখকসঙ্ঘের তরফ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাহিত্যের উপর ছোট ছোট এক একখানি বই যাতে বেরোয় তার আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া। তিনি আমাকে ভার দেন বাংলাসাহিত্যের। শ্রীমতী লীলা রায়ের সহযোগিতায় আমি একখানি ছোট বই লিখি ইংরেজীতে। তখন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া রামানন্দবাবুর কাছে সেখানি পাঠিয়ে দেন অনুমোদনের জন্যে এবং অনুমোদিত হলে ভূমিকা লিখনের জন্যে। এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার বহু আলোচনা হয়। সব মনে নেই। মনে থাকলেও গোপনীয়তা ভঙ্গ করা উচিত নয়। একজনের প্রশংসা করে আমি কিছু লিখেছিলুম। তিনি বলেন লেখক হিসেবে সেই ব্যক্তি বাংলাসাহিত্যে ঠাঁই পেতে পারেন, কিন্তু জালিয়াত হিসেবে তাঁর স্থান কারাগারে। রামানন্দবাবুই ক্ষমা করে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এ কথা শোনার পর আমার রচনার সম্মার্জনা করতে হলো। এমনি আরো কতক জায়গায়। মহাবিপদে ফেললেন তিনি আমাকে যখন বললেন যে মাইকেলের দ্বিতীয়া পত্নী বিবাহিতা ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথকে মোটের উপর সুখী লিখেছিলুম। তাতেও রামানন্দ-বাবুর আপত্তি। বললেন, "আপনি জানেন না যে রবীন্দ্রনাথের মতো দুঃখী মানুষ আর নেই।" এই বলে আমাকে জানালেন রবীন্দ্রনাথের কী কী দুঃখ। কেন দুঃখ। সেসব কথা আমি তখনো প্রকাশ করিনি, এখনো প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত। সবজান্তা জার্নালিস্টের হাতে পড়ে আমাকে অনেকগুলি মোহ বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু রামানন্দবাবু আমাকে আদৌ বাধ্য করেননি। বরাবরই বলেছেন, "আমি সাংবাদিক। সাহিত্যের কী বুঝি! কতটুকু জানি! আমার মতো

অজ্ঞ আর নেই। তবে আমি সর্বদা লক্ষ্য রেখেছি প্রবাসী যাতে সাহিত্যের মান উঁচু রাখে। স্ট্যাণ্ডার্ড সেট করে।"

"প্রবাসী" সম্বন্ধে বলতে বলতে একদিন তিনি একথাও বলেছিলেন, "আপনারা সকলেই প্রবাসীতে লিখেছেন। একালের প্রত্যেকটি লেখক প্রবাসীরও লেখক ছিলেন। কিন্তু একজন বাদ। তাঁর রচনা কোনোদিন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়নি।"

জানতে চাইলুম কে তিনি। উত্তর পেলুম, "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায।"

জেরা করলুম না। তার দরকার ছিল না। ব্রাহ্মসমাজকে শরৎচন্দ্র ক্ষমা করেননি। ব্রাহ্মসমাজও শরৎচন্দ্রকে ক্ষমা করেননি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস "প্রবাসী"তে প্রকাশ কবলে রামানন্দবাবু হয়তো লাভবান হতেন। কিন্তু লাভ লোকসান তাঁব কাছে তুচ্ছ। প্রিন্সিপ্ল তাঁর কাছে বড। যার জন্যে তিনি উপবীত ত্যাগ করেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গেব পর স্বদেশী আন্দোলন আর জালিযানওয়ালাবাগের পর অসহযোগ আন্দোলন। বাংলাসাহিত্যে এ দু'টো আন্দোলনের কোন্‌টার কতখানি প্রভাব? এ প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেন, "স্বদেশীর যুগে যে উদ্দীপনা যে প্রেরণা দেখেছি অসহযোগের যুগে সে রকম কিছু দেখিনি। সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা ইত্যাদি জীবনের সমস্ত বিভাগে স্বদেশীর যুগে যেন বসন্তের আবির্ভাব হযেছিল। কত কম সমযের মধ্যে সাহিত্যের কেমন বিকাশ ঘটল। অসহযোগের মূলস্বুরটা নেগেটিভ। তার থেকে সৃষ্টি আসবে কী করে? রাজনীতি হতে পারে, সাহিত্য হযনি।"

আমার মতো গোঁড়া গান্ধীভক্তের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। কিন্তু হাতের কাছে আমি এর পাল্টা যুক্তি খুঁজে পাইনি। সত্যিই তো। অসহযোগ আন্দোলনের সাহিত্যিক ফলশ্রুতি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তুলনায় নিকৃষ্ট। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে নেই। ভারতের অন্যান্য

প্রান্তে গান্ধীজীর আহ্বানে জনসমুদ্র উদ্বেল হয়। সেইসঙ্গে সাহিত্যেও জোয়ার আসে। রবীন্দ্র ঐতিহ্যে লালিত আমরা অসহযোগের সঙ্গে অসহযোগ করি সাহিত্যে। জীবনে যাই করি না কেন। সন্ত্রাসবাদও সাহিত্যে ফুল ফুটিয়ে যায়নি। এখনো ফোটাচ্ছে না।

রামানন্দবাবু ও আমি দু'জনেই যখন বাঁকুড়ায় তখন ১৯৭২ সালের আগস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। খবরের কাগজ বন্ধ। খবর আসতে থাকে লোকমুখে। রোমাঞ্চকর খবর। আমি যদিও অহিংসার পক্ষে তবু আমার মতে অত বড একটা জাতীয় সঙ্কটে দেশের লোক যদি অহিংসার সেনাপতির অভাবে নেতৃহীন হয়ে অহিংসার চেয়ে হিংসায় অধিক পৌরুষ দেখায় সেটা কাপুরুষতার চেয়ে বা নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে ভালো। আমি ভেবেছিলুম রামানন্দবাবুও তাই বলবেন। দেখলুম তাঁর মত অন্যরকম।

তিনি বললেন, "কাজটা ভালো হচ্ছে না। আন্দোলনটা এই যে হিংসার দিকে মোড নিচ্ছে এতে ইংরেজেরই সুবিধে। ইংরেজ ভালো করেই জানে কেমন করে হিংসা দমন করতে হয়। জানে না কেবল অহিংসার সঙ্গে লডতে। অহিংসাকেই ওরা ভয় করে।"

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "এ আন্দোলন বিফল হবে।"

তখন আমি ওটা মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাই হলো। দু'মাসের মধ্যেই দেশ ঠাণ্ডা। তার পর এলো মেদিনীপুরে সমুদ্রের দিক থেকে বান। সে কী দুর্ভোগ! ডাঙায় বাঘ। জলে কুমীর। ইংরেজের রোষ থেকে যদি কেউ বাঁচে তো প্রকৃতির হাতে মরে। বাঁকুড়া থেকে মেডিকাল স্কুলের ছাত্রেরা যায় সেবা করতে।

রামানন্দবাবু কবে বাঁকুড়া থেকে কলকাতা ফিরে গেলেন ঠিক মনে নেই। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। একবার তিনি ও আমি বিষ্ণুপুর গিয়ে সেখানকার স্কুলের সভায় বক্তৃতা

দিই। আমার বক্তব্য তাঁর অনুরোধে সংক্ষেপে লিখে দিই। তিনি "প্রবাসী"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করেন। একদা কৈশোরে "প্রবাসী"তেই আমার হাতে খড়ি। সে সময় রামানন্দবাবুকে একখানি চিঠি লিখে তাঁর অটোগ্রাফ আর ফোটোগ্রাফ চেয়েছিলুম। ফোটোগ্রাফ তিনি দিতে পারেননি। অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে যা লিখেছিলেন তার একটা কথা এখনো আমার স্মরণ আছে। বলেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে কারো একটু সেবা করতে পারলে মনে তৃপ্তি হয়।

উপরে যে সব কথাবার্তা লিপিবদ্ধ হলো সেসব নোট থেকে নয়, স্মৃতি থেকে। অবিকল রামানন্দবাবুর উক্তি নয়। উক্তির মর্ম। তাঁর মুখে পরের কথা বসিয়ে দিইনি। সতর্ক থেকেছি যাতে তাঁকে ভুল বোঝা না হয়।

ছেলেবেলা থেকেই আমি "প্রবাসী"ও "মডার্ন রিভিউ" পড়ে মানুষ হয়েছি। রামানন্দবাবুর অজ্ঞাতসারে তাঁর হাতে গড়া। কিন্তু "বিচিত্রা"র লেখক হওয়ার পর থেকে ক্রমে দূরে সরে যাই। বাঁকুড়া কিছুদিনের জন্যে নিকট করেছিল। তারই বিবরণ দিলুম।
(১৯৬০)

টলস্টয়

টলস্টয়ের কাছে সাহিত্যসৃষ্টি ছিল গৌণ। মুখ্য ছিল সত্য কথা বলা ও সত্যভাবে বাঁচা। মিথ্যাকে তিনি ঘৃণা করতেন। যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে। শেষ বয়সে এটা একটা বাতিকে দাঁড়িয়েছিল। শুচি-বাতিকের মতো সত্যবাতিক।

এর সূচনা প্রথম বয়সেই। উনিশ বছর বয়সে যখন তিনি ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেন তখন তিনি মনে মনে সংকল্প করেন যে লেখনীর মুখে সত্য বলবেন। পূর্ণ সত্য। সত্য ব্যতীত আর কিছু নয়। সাক্ষীরা যেমন ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে শপথ নেয। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও এত কঠোর ছিল না। সত্য বলা একরকম চলে, কিন্তু পূর্ণ সত্য বলা আদৌ নিরাপদ নয। সত্য ভিন্ন আর কিছু না বললে বড় বড ব্যাপারে মৌন থেকে যেতে হয।

ডাযেরিতে তিনি প্রাণ খুলে যা লিখেছিলেন তা প্রকাশের জন্যে নয়। এমন কি দ্বিতীয কোনো ব্যক্তির চোখে পডবার জন্যেও নয়। তখনো তিনি জানতেন না যে পরে একদিন তিনি সাহিত্যিক হবেন বা তাঁর ডাযেরি স্ত্রীকে পডতে দেবেন বা জগৎকে দেখতে দেবেন। জানলে হযতো তাঁর হাত বেঁকে যেত। সত্য লিখলেও পূর্ণ সত্য লিখতেন না। সত্য ভিন্ন আর কিছু না লিখলে লেখা বন্ধ হয়ে যেত। একেই বলে অজ্ঞতা হচ্ছে আশীর্বাদ।

লিখতে লিখতে ক্রমে হাত খুলে যায। বুঝতে পারেন যে, তাঁব লেখার হাত আছে। তাঁর পিসিমা তাতিযানাও তাঁকে উৎসাহ দেন এই বলে যে, তাঁর যেমন কল্পনার দৌড, কেন যে তিনি উপন্যাস লেখেন না এটা আশ্চর্য। কিন্তু হাজার লিপিকুশলতা ও কল্পনাশক্তি থাকলেও মহান লেখক তিনি হতেন না। তেমন প্রতিভাও তাঁর ছিল না। হলেন তা হলে কোন্ মন্ত্রবলে? সত্যভাষণের সাধনাবলে। সত্যভাষণ হলো এমন এক ডিসিপ্লিন যার কল্যাণে ক্ষুদ্রও মহান হতে পারে। তবে মহান শিল্পী হবে কি না নির্ভর করছে আরো একটা উপাদানের উপরে। কেউ যদি অসার জীবন যাপন করে তবে তার সেই অসার উপলব্ধি দিযে মহান সৃষ্টি হবে কী করে? লিখলই ব. .স প্রাণ খুলে সত্য কথা, পুরো সত্য কথা, সত্য ভিন্ন আর কোনো কথা নয়।

সার অভিজ্ঞতার উপরে টলস্টয়ের প্রখর দৃষ্টি ছিল। পাঁকে ডুবে থাকলেও পঙ্কজকে তিনি ভোলেননি। সত্যকে তিনি কোথায় না অন্বেষণ করেছেন! অস্থানে কুস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, আরণ্যকদের মধ্যে, অভিজাত মহলে, কৃষক সংসর্গে, বন্যপ্রাণী মৃগয়ায়, বেদে বেদেনীদের সান্নিধ্যে। লিখতে বসে সব অভিজ্ঞাতাই তাঁর কাজে লেগে গেল। কিন্তু যার জন্যে তিনি টলস্টয় তা হচ্ছে যুদ্ধের ভিতরকার সারংসত্যকে মোহমুক্ত ভাবে দেখা ও দেখানো। তাকে রোমান্টিক করতে গিয়ে অসত্য করে না তোলা। যুদ্ধবিষয়ক রিপোর্টে বা রচনায় কেউ সত্য কথা লেখে না। ঘটনা ঘটে যাবার পর রটনায় পল্লবিত হয়। ঐতিহাসিকরাও সেই রটনার নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ করতে জানেন না। সত্য এমন লজ্জাকর বা জঘন্য যে তাকে ইচ্ছা করে বিকৃত করা হয়। পরম কাপুরুষও পরম বীর বলে পরিচিত হয়। ঘোড়া হয়তো প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, বীর ভাবছেন তিনিই রাশ ধরে তাকে চালাচ্ছেন। ঘটনা হয়তো আপনি ঘটে যাচ্ছে। সেনাপতি ভাবছেন তাঁর আদেশেই ঘটছে। গৌরবের জন্যে বানানো গল্পও সত্য বলে প্রচলিত হয়। টলস্টয় এই চক্রান্ত ফাঁস করে দেন।

"সমর ও শান্তি" লিখে টলস্টয় বহুলোকের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। বছর পাঁচেক লাগল ও বই লিখে শেষ করতে ও আরো বছর দশেক স্বদেশের স্বীকৃতি পেতে। এর পরে তিনি যা নিয়ে লেখেন সেও এক বিপজ্জনক বিষয়। নরনারীর সাজানো সংসারে স্বতঃস্ফূর্ত অদম্য প্যাশন। যতক্ষণ নীতির সীমার মধ্যে থাকে। যখন সীমার বাইরে চলে যায়। "আনা কারেনিনা" তখনকার দিনে এক দুঃসাহসিক কীর্তি। টলস্টয় যাকে নীতির সঙ্গে সংঘর্ষ মনে করেছিলেন একালের বিদগ্ধ পাঠক তাকে বলবেন সংস্কার, সংসার ও সমাজবিধির সঙ্গে সংঘাত। আনা এমন কোনো চিরন্তন মহাপাতক করেনি যার জন্যে অত বড় একটা

শাস্তিই ছিল তার নিয়তি। তা সত্ত্বেও তার কাহিনীতে নিত্যকালের ট্র্যাজেডীর উপাদান নিহিত ছিল। প্রেমিকের একনিষ্ঠতায় সন্দেহ। তাই ও বই শিল্পলক্ষ্যভ্রষ্ট নীতিগ্রন্থ হয়নি। অপর পক্ষে নীতিনিরপেক্ষ বাস্তববাদী চিত্রকর্মও নয়। সত্যের অন্বেষক অত সহজে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এইখানে সমসাময়িক ফরাসী কথাশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা। পরবর্তী যুগের কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গেও।

তাঁর ওই দু'খানি মহা উপন্যাস মহাকাব্যজাতীয়। বলা যেতে পারে একালের মহাভারত ও রামায়ণ। অবশ্য অন্য প্রকার। মানুষের জীবনে নিয়তির হাতই তিনি লক্ষ করেছেন। তাই মানুষকে ক্ষমাযোগ্য করেছেন। এক নেপোলিয়ন বাদে অমার্জনীয় কেউ নয়। যারা নিজের মতো করে বাঁচতে চায়, অথচ নিয়তির দ্বারা চালিত হয় তাদের প্রতি তাঁর অপার করুণা। কিন্তু মন্দ মানুষকে বা মন্দকারীকে ভালোবাসেন বলে তিনি মন্দকে ভালো বলেন না। মন্দত্বের প্রতি তাঁর লেশমাত্র সহানুভূতি নেই। এইখানেও তাঁর সঙ্গে তাঁর বাস্তববাদী সহযোগী ও পরবর্তীদের প্রতিতুলনা। ভালো আর মন্দকে তিনি যেমন সাদা আর কালোর মতো স্বতোবিরুদ্ধ মনে করতেন একালের বিদগ্ধ সাহিত্যিকরা তেমন মনে করেন না। বহুক্ষেত্রে ভালোমন্দ একাকার বা অনুপস্থিত। সত্য অনেক সময় ভালোমন্দের অতীত। সত্য শুধুমাত্র সত্য। ভালোও নয়, মন্দও নয়। সর্ব বিশেষণ বর্জিত।

গোড়াতেই বলেছি যে সাহিত্যসৃষ্টি টলস্টয়ের কাছে গৌণ ছিল। ইংরেজরা যেমন বাণিজ্য করতে এসে সাম্রাজ্য লাভ করে তিনিও তেমনি ডায়েরি লিখতে গিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। বছর পঞ্চাশ বয়সে কীর্তির ও যশের ও বিত্তের শিখরে উঠে কোথায় তিনি আনন্দ করবেন, তা নয়। চাইলেন সত্যভাবে বাঁচতে। জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করতে। প্রথমে তাঁর আপনার। পরে তাঁর স্বদেশের ও স্বকালের।

জীবনজিজ্ঞাসা বরাবর তাঁর কাছে মুখ্য ছিল। অল্প বয়স থেকেই তিনি জীবন মৃত্যু, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর ও অমরত্ব নিয়ে চিন্তাকুল। বাণপ্রস্থের বয়স যখন হলো তখন তিনি সাহিত্যসৃষ্টি ছেড়ে পরমার্থে মন দিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে এটা মস্ত বড় একটা লোকসান। কি রাশিয়ায় কি অন্যদেশের কথাশিল্পে "আনা কারেনিনা"র পরে আর ক্লাসিক লেখা হলো না। হতে পারত যদি টলস্টয় মন খোলা রাখতেন। কিন্তু মনটা হলো তাঁর দায়বদ্ধ। আত্মোদ্ধারের দায়। মানব উদ্ধারের দায়। সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে হিংসার হাত থেকে, অসত্যের হাত থেকে। তার জন্য সত্যভাবে বাঁচতে হবে।

বিশেষ করে রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে বিপ্লবের হাত থেকে, যুদ্ধের হাত থেকে। এমনি গভীর ছিল তাঁর ইতিহাসদৃষ্টি যে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বিপ্লব আসছে, যুদ্ধ আসছে। বাইবেলে আছে পয়গম্বর নূ (Noah) আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন যে মহাপ্লাবন আসছে, সৃষ্টি লুপ্ত হবে। তাঁর স্ত্রীকে সেকথা বলায় ভদ্রমহিলা বিশ্বাসই করলেন না। টলস্টয়ের পরিবারেও সেই পুরাণবর্ণিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হলো। টলস্টয় উঠে পড়ে লেগে গেলেন জীবনযাত্রার ধরন ধারন বদলাতে ও শোধরাতে। যাদের পিঠে চড়ে বসেছেন তাদের পিঠ থেকে নামতে। চাষীদের সঙ্গে একাত্ম হতে। তাদেরি একজন বনে যেতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কে একজন গান্ধী পর্যন্ত তাঁর কথা শুনে তাঁর অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁর নিজের গৃহিণীর কানে একটি কথাও গেল না। যুদ্ধ আর বিপ্লব দুই দেখতে বেঁচে রইলেন কাউণ্টেস। টলস্টয় বেঁচে গেলেন তার আগে মরে।

যুদ্ধ আর বিপ্লবের মতো মৃত্যুও ছিল তাঁর আরেক ধ্যান। সত্যভাবে বাঁচলে যুদ্ধ ও বিপ্লব এড়ানো যায়, মৃত্যু অনিবার্য। তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছর এই নিয়ে মেঘলা ছিল। 'জীবনের অর্থের জন্যে তিনি

খ্রীস্টমার্গে বিশ্বাসী হন। প্রচলিত খ্রীস্টধর্মে তাঁর ঘোর অনাস্থা। পেছিয়ে যেতে যেতে তিনি চলে গেলেন যীশুখ্রীস্টের জীবনকালে। আদি খ্রীস্টবচনই হলো তাঁর ধর্ম। শোষণ ও হিংসার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে বেধেছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত। এবার বাধল খ্রীস্টমার্গচ্যুত চার্চের সঙ্গে। একা টলস্টয় লড়তে লাগলেন দুই মহাশক্তির সঙ্গে। রাষ্ট্রের সঙ্গে। চার্চের সঙ্গে। সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা বড় কম। বলা বাহুল্য মিলটনের মতো টলস্টয়ও লেখনীকে তরবারি করেছিলেন। খরধার তরবারি। কিন্তু মিলটনের পিছনে দল ছিল। টলস্টয় সম্পূর্ণ একলা। দানবের বল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। দানবও ছিলেন প্রথম যৌবনে। সেই বলের যেই সদ্ব্যবহার হলো অমনি তাঁরও রূপান্তর ঘটল। তিনি হলেন মহামানব। যে হাতে কলম সেই হাতে বন্দুক ছিল একদা। বন্দুক গেল। তার বদলে এলো চাষী ও মুচির হাতিয়ার। মদ্য মাংস ইত্যাদি পঞ্চ ম-কার গেল। রাজসিক হলেন সাত্ত্বিক। কিন্তু সব পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি যোদ্ধা। বার্ধক্যে তাঁর যুদ্ধ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, চার্চের বিরুদ্ধে।

সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো, ঠিক। কিন্তু লাভবানও হলো। কারণ তাঁর শেষ বয়সের লেখা ‘’গুলি নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক বলে বিস্মরণীয় নয়। শিল্পীসুলভ চাতুরী তিনি ষষ্ঠ ম-কারের মতো বর্জন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও—বোধহয় সেইজন্যেই—“আইভান ইলিচের মৃত্যু,” “প্রভু ও ভৃত্য” প্রভৃতি কাহিনীগুলি অন্তরকে উদ্বেল করে, সারা জীবন মনে থাকে, অলক্ষিতে জীবনকে বদলে দেয়। কী করে বলি যে এসব আর্ট নয়? হাঁ, এগুলিও আর্ট। তবে এই একমাত্র আর্ট নয়। টলস্টয় বললেও না। অপর পক্ষে “সমর ও শান্তি”ও আর্ট। “আনা কারেনিনা”ও আর্ট। টলস্টয় না বললেও আর্ট। শেষের দিকে তিনি “দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন” হয়েছিলেন। তাই নিজের কীর্তিকেও ভস্ম

করতে না চান, ছাইভস্ম মনে করেছিলেন। এটাও একপ্রকার শুচিবাতিক। কিন্তু এর আরো একটা কারণ আছে। সেটা আরো গভীর।

নিজের পূর্বজীবনকে কাটিয়ে ওঠা এক কথা। তাকে খারিজ করা অন্য জিনিস। তিনি কাটিয়ে উঠে ক্ষান্ত হবেন না। সরাসরি খারিজ করবেন। যেহেতু রিপুর তাড়নায় অনেকগুলো পাপ করে ফেলেছিলেন। না জেনে কারো কারো সর্বনাশও। অনুতাপ তাঁর মতো আর কে এত করেছে! দুনিয়াকে নিজের স্খলন পতন ত্রুটির কথা কে এমন নির্মম ভাবে শুনিয়েছে! ডায়েরিও প্রকাশ করা হলো তাঁরই ইচ্ছায়। তবে পরিবারের মুখ চেয়ে কতক বাদসাদ দিয়ে। লোকে তাঁকে জুতো মারুক এই তিনি চেয়েছিলেন, ভাবীকাল তাঁকে মাথায় করে রেখেছে। তিনি সত্যকুলজাত।

মহর্ষি কার্বে

বিশ বছর আগে পুনা বেড়াতে যাই। পুনার অন্যতম দ্রষ্টব্য মহর্ষি কার্বের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। কয়েক বছর পরে লেখা 'চেনাশোনা'য় এর উল্লেখ আছে। তুলে দিচ্ছি।—

"পরের দিন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলুম। মহারাষ্ট্রের আরেকটি অনুপম কীর্তি। কার্বের দর্শন পাওয়া গেল। সাদাসিদে নিরীহ মানুষটিকে দেখে দিনমজুর ভেবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলুম। অল্‌তেকর বললেন, ইনিই কার্বে। অশীতিপর বৃদ্ধ। সেকালের মহাস্থবির। একদা এঁরাই ভারতের সংঘপতি ছিলেন। কখনো

মিলিত হতেন পাটলিপুত্রে, কখনো পুরুষপুরে, কখনো নালন্দায়, কখনো বিক্রমশিলায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু কার্বের কাজ মহিলাদের নিয়ে। তাঁর আবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা মাতৃজাতির শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। মরাঠীর মতো একটি প্রাদেশিক ভাষায় ক'খানাই বা কেতাব আছে যা পড়ে ইতিহাসে দর্শনে গণিতে বা রসায়নে গ্রাজুয়েট হওয়া যায়? তবু কার্বের দুঃসাহসে তাও সম্ভব হয়েছে। পরে এক গুজরাতী কুবেরজায়ার দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হয়েছে। গুজরাতী মেয়েদের জন্যে শিক্ষার বাহন হয়েছে গুজরাতী। তাদের সুবিধার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তরিত হয়েছে বম্বেতে। পুনায় যেটুকু আছে সেটুকু দেখে সম্যক ধারণা হলো না।"

তখন তো কল্পনাও করি নি যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো কৃশকায় সেই অশীতিপর বৃদ্ধ শতায়ু হবেন। যেমন-তেমন করে শতায়ু হতে আরো কেউ কেউ পেরেছেন। মহর্ষি কার্বের বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিদিন কর্ম করতে করতে শতায়ু হওয়া। একদিনও তিনি বললেন না যে, আর পারছিনে, এবার অবসর নেব। একটার পর একটা প্রতিষ্ঠান পত্তন করতে করতে চলেছেন। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কীর্তিমালার মধ্যে আদ্য নয়, অন্ত্য নয়।

বাল্যকাল থেকে কঠোর পরিশ্রম ও স্বাবলম্বনের দ্বারা উচ্চশিক্ষায় উপনীত হয়ে তিনি স্থির করলেন অপরকে শিক্ষাদানই তাঁর জীবনের কাজ। সামান্য বেতনে পুনার ডেকান এডুকেশন সোসাইটির সভ্যরূপে ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো অধ্যাপক হলেন সমাজসংস্কারক। স্বয়ং বিধবা বিবাহ করে দৃষ্টান্ত দেখালেন। বিধবা কন্যাদের জন্যে স্থাপন করলেন 'অনাথ-বালিকাশ্রম'। হৃদয়ঙ্গম করলেন যে বিধবা কন্যার বিবাহ পরের কথা, তার আগের কথা শিক্ষা

ও স্বাবলম্বন। এ কাজে তাঁর সাফল্য লক্ষ করে অভিভাবকরা পাঠাতে চান বিধবা কন্যার সঙ্গে কুমারী বোনকেও। তখন প্রতিষ্ঠা করতে হলো মহিলা বিদ্যালয়। অধ্যাপক অবসর নিয়ে স্ত্রীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। নারীকে তিনি এমন শিক্ষা দেবেন যার ফলে নারী হবে সুগৃহিণী, সুমাতা, অথচ প্রয়োজন হলে স্বাবলম্বিনী। সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক উৎকর্ষও হবে।

এই নিয়ে তিনি আছেন, এমন সময় তাঁর হাতে পড়ল জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্র। কার্বের বয়স তখন সাতান্ন। কোথায় বানপ্রস্থের আয়োজন করবেন, তা নয়, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ক্ষেপলেন। বন্ধুরা বললেন, মেয়েদের জন্যে আলাদা একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেন, বাপু ? আর, তোমার সে বিশ্ববিদ্যালয় টিকবেই বা কতদিন ? আর তুমি তো বিশ বছর ধরে বিধবা ও কুমারী কন্যাদের পড়িয়ে একজনকেও ম্যাট্রিক পাস করাতে পার নি। তোমার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়বে কারা ? কার্বে নাছোড়বান্দা। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় তিনি গড়বেনই। পড়াশুনার মাধ্যম হবে মরাঠী বা মাতৃভাষা। সব রকম বিদ্যাই শেখানো হবে, তবে জোর দেওয়া হবে নারীর স্বতন্ত্র প্রয়োজনের উপর। এতে বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক নটরাজনের আপত্তি। নারীকে স্বতন্ত্র শিক্ষা দেওয়া তো তাকে পুরুষের সমকক্ষ হবার সুযোগ না দেওয়া। নারী তা হলে চিরকাল শূদ্রের মতো অসম অধম থেকে যাবে। দেখা গেল কার্বের পিছনে যেমন রক্ষণশীলরা নেই তেমনি উদারনীতিকরাও নেই। তা সত্ত্বেও তাঁর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় একটু একটু করে দাঁড়িয়ে গেল। ক্রমে ডালপালা মেলল। পুনা থেকে গেল বম্বে। সেখানে গুজরাতী শাখা মরাঠীর সমান হল। এখানে বলে রাখি শিক্ষার মাধ্যম না হলেও অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল ইংরেজী। গান্ধীজীর আপত্তিসত্ত্বে।

কার্বে কারো মন যোগাবার পাত্র নন। পদে পদে মতান্তর হয়েছে গুরুজনের সঙ্গে, সমাজের দশজনের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে। মতান্তরকে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, সহিষ্ণুতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। দীর্ঘ জীবনে একবারমাত্র তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। 'নিষ্কামকর্ম মঠ' অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। এটা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে। আশি বছর বয়সে কার্বে উপলব্ধি করলেন এতদিন যা-কিছু করেছেন তা মধ্যবিত্তদের জন্যে। চাষীমজুরদের জন্যে তো কিছু করা হয় নি। তখন গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্যে এক সমিতি করলেন। ক্রমে উপলব্ধি করলেন মানুষে মানুষে সমতা নেই। তার কী উপায়? উপায় 'সমতা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা। তার পর নব্বুই বছর বয়সে এই ব্রাহ্মণ-সন্তান অনুভব করলেন যে জাতিভেদ থাকতে সমতা অসম্ভব। সৃষ্টি করলেন 'জাতিনির্মূলন সংস্থা'। শতজীবী পুরুষের বর্তমান ধ্যান ভারতবর্ষ থেকে জাতিপ্রথা উৎসাদন করা। ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় নির্ব্রাহ্মণ নির্বৈশ্য নিঃশূদ্র নিষ্পঞ্চম করা। তা হলে আরো এক শতাব্দী বাঁচতে হয় তাঁকে। আমরা এই ভারতরত্নের দ্বিতীয় শতাব্দীপূর্তি তথা ব্রতসিদ্ধি কামনা করি।

(১৯৫৮)